সালংকারা

আভেনির ॥ কলকাতা ২৯

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৬৫

প্রকাশক
অমলেন্দু চক্রবর্তী
আভেনির
১০৬ এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা ২৯

প্রচ্ছদশিল্পী
গণেশ বসু

মুদ্রক
শ্রীকালিপদ দত্ত
করুণা প্রিণ্টার্স
২৯।২ অরবিন্দ সরণি
কলকাতা ৫

স্নেহাস্পদ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র-কে দিলাম।

—দাদা॥

গল্পক্রম : ঘটনা সামান্ত, রোদ, ছেঁড়া চিঠি, শবরী, ফোন, কালবৈশাখী, লেভেল ক্রসিং ॥

সা ল ং কা রা

বছর কয়েক আগের ব্যাপার।

তবু খবরটা বোধহয় অনেকের চোখে পড়েছিল। বিশেষ করে এসব বিবরণ খুঁটিয়ে পড়া যাঁদের শখ তাঁদের দৃষ্টি নিশ্চয় এড়ায় নি।

তা নিয়ে তাঁরা খুব বেশি কিছু বিচলিত হয়েছেন কিনা অবশ্য বলা শক্ত। কারণ প্রায় প্রত্যেকদিনই ওরকম দু-একটা চাঞ্চল্যকর খবর কাগজের কোথাও না কোথাও থাকে। নিত্য পড়ে পড়ে এবং খবরের কাগজের মামুলী রঙ চড়ানো বর্ণনার গুণে তার মধ্যে সাড়া তোলবার আর বিশেষ কিছু থাকে না। সব উত্তেজনা শিরোনামার নিচেই যায় নেতিয়ে।

এ-ঘটনার সাড়াও ওই খবরের কাগজের পাতাতেই ফুরিয়ে যেত যদি না স্বনামধন্য এক লেখক কি বুঝে নিউজপ্রিণ্টের আলগা ছড়ানো পাতা থেকে বত্রিশ পাউণ্ড ডবল ডিমাই অ্যান্টিকে মনোটাইপে তা তুলে নিয়ে চাররঙা ব্লকের প্রচ্ছদপটে সাজিয়ে বাঁধিয়ে ফেলতেন।

দৈনিক কাগজের মেছোহাটা থেকে মলাট দেওয়া সাহিত্যের আভিজাত্যে পৌঁছে মূল খবরের চেহারা চরিত্র সবই অনেক কিছু বদলে গেছল সন্দেহ নেই। ডবল কলম হেডিং হলেও ষোল নয়া পয়সার কাগজের চার ইঞ্চির খবর তিনশ চৌষট্টি পাতার নগদ আট টাকা মূল্যের উপন্যাসে সব ভোল একেবারে পালটে ফেলেছিল।

তখনই যাকে চেনা দায়, বই-এর মলাট খুলে বেরিয়ে সিনেমার রুপালী পর্দায় গিয়ে ওঠবার পর তার কতখানি রূপান্তর যে হয়েছিল তা অনায়াসে বোধহয় অনুমান করা যেতে পারে।

স্বনামধন্য লেখকের নামকরা বইটি পড়বার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সে-বই-এর চিত্ররূপের জয়জয়কারের খবর পোস্টারে

হ্যাণ্ডবিলে শহরের সমস্ত রাস্তা ছেয়ে দেবার পর কোন এক শহরতলির সিনেমা হলে সপ্তম সপ্তাহের এক ঝড় বাদলের রাতে নটার শো-তে ছবিটি আমি দেখবার সুযোগ পাই।

ঝড় বাদল না হলে সে-সুযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যেত না, কারণ দিনের পর দিন শহর থেকে মফঃস্বল সর্বত্র ভদ্রলোকের এক কথার মত এ-ছবি যেখানে দেখান হয়েছে সেখানেই একটি বোর্ড ঝুলতে দেখা গেছে, যার অর্থ হল ন স্থানং তিলধারয়েৎ।

সেই ঝড় বাদলের রাত্রেও প্রায় হল্‌-ভর্তি দর্শকের সঙ্গে ছবিটি দেখতে দেখতে যে অভিভূত হয়ে গেছলাম এ-কথা অকপটভাবে স্বীকার করছি। ছবির 'ঝটিকা' নাম সত্যিই সে-রাত্রে সার্থক মনে হয়েছে।

ছবি শেষ হবার পর কোনরকমে চারগুণ ভাড়া দিয়ে একটি রিকশা জোগাড় করে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছাড়ার পর প্রথমেই পুরনো খবরের কাগজের কাটিং আঁটা আমার সংগ্রহের খাতাটির খোঁজ করেছি।

হ্যাঁ, যে-খবর বিস্তারিত ও বিস্ফারিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ছায়াছবির পর্দা কাঁপিয়ে তুলেছে তা আমি যত্ন করে আমার সংগ্রহের খাতায় জুড়ে রেখেছিলাম। কেন রেখেছিলাম তা অচিরেই জানা যাবে।

সিনেমার পর্দায় 'ঝটিকা' ছবিটি দেখেন নি এমন খুব কম লোকই বোধহয় আছেন। যদি সেরকম মন্দভাগ্য কেউ থাকেন তাঁর জন্যে চিত্রিত কাহিনীটির একটু আভাস মাত্র দিচ্ছি।

মাত্র তিনটি মানুষ নিয়ে ছবি, কিন্তু সেই তিনটি মানুষের জীবননাট্য যেন আদিম প্রকৃতির প্রচণ্ডতা আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছে।

ছবির শুরুতেই ঝড়ের আগের সেই থমথমে অবস্থা আমরা পেয়েছি। দিগ্বিদিক যেন কি এক আশঙ্কার উত্তেজনায় নিঃশ্বাস রোধ করে অপেক্ষা করছে।

লেখক, চিত্রনাট্যকার বা পরিচালক, কার বাহাত্বরি জানি না, কিন্তু ছবির আক্ষরিক পরিচয়লিপি পর্দায মিলিযে যাওয়ার সঙ্গে প্রথম দৃশ্যের প্রথম ছবিই মনটাকে ধরে ফেলে।

সেই দেওয়াল ঘড়িটার দোলকটা ত্বলছে তো ত্বলছেই। সেই দোলনের একঘেযেমি যখন প্রায় অসহ্য হযে উঠেছে তখন ক্যামেরা নেমে এসেছে দেওয়ালের গা বেয়ে পাশের একটা টেবিলের ওপর রাখা শাদা টেলিফোন যন্ত্রটা একটু ছুঁয়ে, অনবরত বুনে চলা ত্বটো ক্রুশকাঠির ওপর।

ছবি নেওযার কায়দায় ক্রুশকাঠি ত্বটো নিরীহ একটা বয়নের উপকরণের বদলে যেন ত্বটো ভয়াবহ অস্ত্র বলে মনে হয়। 'লেস'-এর বুনুনিটা পর্দায় অতিকায হয়ে সমস্ত দৃষ্টি ঢেকে দেওয়া একটা মায়াজাল হযে ওঠে।

তারপরেও ক্যামেরার চোখের পাতা পড়ে না বলা যায়। ক্রুশ-কাঠি আর পশমেব বুনুনি থেকে একটি সুঠাম যৌবনশ্রীমণ্ডিত রমণীর উর্ধ্বাঙ্গ বেয়ে উঠে শুধু ত্বটি চোখের ওপর গিয়ে ক্যামেরা যেন স্তম্ভিত স্তব্ধ হয়ে যায়।

শুধু ত্বটি চোখ। নারীদেহের অঙ্গমাত্র নয়, যেন ত্বটি পৃথক জীবন্ত সত্তা এক ছন্দে বাঁধা।

চোখ ত্বটির তারা দক্ষিণ আঁখিকোণে একটু হেলে প্রায় স্থির হযে আছে। মাঝে মাঝে শুধু কেঁপে উঠছে কোন রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার উত্তেজনায়। সে-উত্তেজনায় আতঙ্ক না আকুলতা বোঝা কঠিন। হয়ত ত্বই-ই তার মধ্যে মেশানো।

দেওয়ালঘড়ির দোলকের টক্‌টক্ ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না এতক্ষণ।

হঠাৎ সে-শব্দ ছাপিয়ে টেলিফোনের যন্ত্রটা যেন আর্তনাদ করে বেজে ওঠে। শুধু পর্দাজোড়া ত্বটি চোখের তারার কম্পনে সে-আর্তনাদের প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই।

একবার দুবার তিনবার টেলিফোন বেজে যায়। চোখের তারায় অদ্ভুত একটা ঝিলিক যেন দেখা যায়।

ক্যামেরার চোখেও সেই সঙ্গে পলক পড়ে এতক্ষণে।

চোখ খুলেই আবার দেখি সেই টেলিফোনের রিসিভার। একটি কোমল রঞ্জিত দীর্ঘনখাগ্রশোভিত হাত রিসিভারটা তুলেও মাঝপথে খানিক ধরে থেকে কান পর্যন্ত না উঠিয়েই নামিয়ে রাখে। নামিয়ে রাখে টেলিফোনের যন্ত্রের যথাস্থানে নয়, টেবিলের ওপরে।

ক্যামেরা পেছনে সরে আসে।

মেয়েটির দীর্ঘ সুগঠিত দেহ দেখতে পাই টেবিলে হেলান দিয়ে ফোনের দিকে পিছন ফিরে আমাদের দিকে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

টেলিফোনের রিসিভারে কার ব্যাকুল মিনতির যান্ত্রিক বিকৃত বিদ্রূপ শোনা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

—শোন ইলা, শোন! আমি জানি তুমিই ফোন ধরেছ, তুমিই ফোন নামিয়ে রেখেছ নিষ্ঠুর হয়ে। একটিবার শুধু আমায় সুযোগ দাও দুটো কথা বলবার। এই শেষবার ইলা। আর আমি কোনদিন তোমায় বিরক্ত করব না। ইলা! আমার বিছানা থেকে ওঠবার ক্ষমতা নেই। নইলে আমি তোমার দরজায় গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতাম আমার শেষ কথা বলবার জন্যে। শেষ কথা না বলে আমি মরতে পর্যন্ত পারছি না ইলা। ইলা···

ইলা ফোনটা হঠাৎ টেবিল থেকে তুলে যথাস্থানে হোল্ডারের ওপর নামিয়ে দেয়।

কাতর যান্ত্রিক আর্ত আহ্বানের ওপর স্তব্ধতার যবনিকা অকস্মাৎ।

না! স্তব্ধতা নয়, দেওয়াল ঘড়ির টক্‌টক্ শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, বাড়ছে ক্রমশ, দুঃসহ ধ্বনিতে-প্রতিধ্বনিতে সমস্ত চেতনাকে অস্থির করে তুলে শেষে সেটা মিলিয়ে যাচ্ছে একটা গাঢ় অবসাদ রেখে।

আরম্ভটাই এত বিশদভাবে বর্ণনা করলাম শুধু এ-ছবির নির্মাণ

কৌশলের বিশেষ প্রেরণাটি বোঝাবার জন্তে। এ-কৌশলের মধ্যে অভূতপূর্ব কোন বাহাদুরি হয়ত নেই, কিন্তু নিছক নতুনত্বের জাঁক করতে না পারলেও চিত্রগ্রহণের যা আসল উদ্দেশ্য তা এ-কৌশলে সফল হয়েছে।

আমাদের একান্ত একাগ্র করে তুলে একটি চড়া সুরে এই সূচনাই আমাদের মনকে বেঁধে দিয়েছে।

সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের কৌতূহলকে শানিত করে তোলার সঙ্গে যে-সব নাটকীয় মুহূর্ত ছবির পর্দায় কাহিনীকার ও পরিচালক সৃষ্টি করেছেন তা ভোলবার নয়। কাহিনী বেশ কিছুটা অস্বাভাবিক ও নীতির প্রশ্নের দিক দিয়ে দুঃসাহসিক হলেও নিতান্ত সাধারণ দর্শকও তার নাটকীয় তীব্রতায় অভিভূত না হয়ে পারে নি।

টেলিফোনের বিকৃত যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরেই যাকে আমরা ছবির গোড়ায় চিনেছি, প্রায় আধঘণ্টা পার হওয়ার পর তার চাক্ষুস দেখা আমাদের মিলেছে।

এই আধঘণ্টা সময় আমরা প্রধানতঃ দুটি চরিত্রকেই দেখেছি। ইলা আর তার হাসিখুশী নেহাত সরল ভালমানুষ গোছের স্বামী সোমনাথকে।

অক্ষম হাতে পড়লে চিত্রটি এইখানেই ঝুলে যেত নিশ্চয়। শুধু স্বামী-স্ত্রী দুজনকে নিয়ে প্রায় আড়াই হাজার ফুট ফিল্ম-এর আগ্রহ বজায় রাখা তো সোজা কথা নয়।

'ঝটিকা' ছবিটিতে কিন্তু তাই করা হয়েছে নিপুণভাবে।

অতি তুচ্ছ সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার মধ্যে একটা কি তাৎপর্য যেন ফুটে বার হতে চেয়েছে।

তার চেয়েও বেশি যা দর্শকের মনকে একরকম সন্ত্রস্ত করে রেখেছে বলা যায়, তা হল সব কিছুর নেপথ্যে এমন একটা বিস্ফোরণের উপাদান যা যে কোন মুহূর্তে সব কিছু চুরমার করে দিতে পারে।

সাধারণ সামাজিক কাহিনীতে রহস্য রোমাঞ্চধর্মী এই উত্তেজনা ও উদ্বেগ সঞ্চার করাই একটা নতুন বৈচিত্র্য। কিন্তু এই বৈচিত্র্য আনা হয়েছে মামুলী সস্তা কোন পদ্ধতিতে নয়।

দর্শক হিসেবে সারাক্ষণ সজাগ হয়ে থেকেছি কোথায় অতর্কিতে আততায়ীর ছুরিকা ঝলসে উঠবে এই ধরনের আতঙ্কে নয়। কি যেন একটা ফাঁপা ঠুনকো পাতলা কাঁচের মেঝের ওপর চলে ফিরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ মাঝে মাঝে নিচের গভীর অন্ধকার অতলতা আভাসে ইঙ্গিতে টের পাচ্ছি বলেই সন্ত্রস্ত।

সেই বৃষ্টির রাত্রের দৃশ্যটাই ধরা যাক।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ার ছবিটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শুধু একটা রাস্তার বাতি, তার পাশের টেলিগ্রাফের তার ও সেই তারে আটকানো একটা ছেঁড়া ঘুড়ির সাহায্যে।

বৃষ্টির ঝাপটায় বাতির চারিদিকে একটা ঝাপসা আলোর মণ্ডল গড়ে উঠেছে। টেলিগ্রাফের সব কটা তার বেয়ে জলের কণাগুলো দ্রুতবেগে গড়াতে গড়াতে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে হঠাৎ আমাদের চোখের ওপরেই যেন পড়ে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে তারে লটকানো ছেঁড়া ঘুড়িটা বৃষ্টির ধারায় আর সামান্য হাওয়ার দোলায় অস্থির হয়ে ছটফট করছে যেন কোন অদ্ভুত অবাস্তব পাখির মত।

এ-দৃশ্যের সঙ্গে পালটাপালটি করে সাজানো আর একটি ছবি থেকে থেকে দেখা গেছে।

কাঁচের শার্সির সঙ্গে একেবারে লেপটানো ইলার মুখ।

সে-মুখ যেন মোম দিয়ে তৈরি। তাতে আনন্দ বেদনা আশা আশঙ্কা কোন ভাবের লেশমাত্র নেই।

সেই মোমে-তৈরি মুখের মরা চোখের দৃষ্টিতে একটু বুঝি সাড়া দেখা যায়।

কেন?

না, এমন কিছু নয়। ছেঁড়া ঘুড়িটার ছটফটানি ক্রমশই বুঝি

শান্ত হয়ে আসছিল ভিজে চুপসে নেতিয়ে গিয়ে। এবার তার একটা টুকরো নিচে পড়ে গেল ছিঁড়ে।

এই তারে লটকানো ছেঁড়া ঘুড়ির ভিজে টুকরো পড়ে যাওয়ার মধ্যে কোন গভীর রূপক কি চিত্রকল্প যদি থাকে তাহলে আমার মত মাটো দর্শক তা ধরতে পারে নি। কিন্তু যথার্থ ইঙ্গিত না বুঝলেও ছবি নেওয়ার গুণে মনের মধ্যে একটা নাড়া অনুভব করেছি ঠিকই।

ছেঁড়া ভিজে টুকরোটুকু পড়ে যাওয়ার বেলা একটা ঘটনা সন্নিপাতের সুযোগ নেওয়া হয়েছে। টুকরোটা নিচে খোলা একটা ছাতার ওপর গিয়ে পড়ে।

ছাতাটা যে সোমনাথের তা জানতে পারি খানিকদূর অনুসরণ করার পর সেটা মোড়া হলে।

ভিজে ঘুড়ির টুকরোটা যে সোমনাথের অগোচরে তখনও ছাতাটার গায়ে লেপটে আছে পরিচালক তা আমাদের ভুলতে দেন না।

ভিজে ছাতা সমেত সোমনাথকে লম্বা একটা সিঁড়িতে তুলে ক্যামেরা একটু পিছিয়ে মুখ নামিয়ে এবার চলে। সোমনাথের ভিজে জুতোর ছাপ আর ছাতা থেকে গড়ানো জলের ধারাই আমরা দেখতে পাই। সোমনাথ তখন ছবির ফ্রেমে নেই।

সোমনাথ সশরীরে নেই, কিন্তু তার উচ্ছ্বসিত আনন্দের ডাক হল্‌ময় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

—ইলা! ইলা! কোথায়? শীগগির এসে দেখে যাও।

—কি দেখব কি?

ইলাকে দেখতে পাই না, শুধু তার কণ্ঠস্বর শুনি। সে-কণ্ঠস্বরে ঔদাসীন্য কি ক্লান্তি নেই, তবু উৎসাহটা যেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়।

—বাঃ, কি দেখবে এখনো জিজ্ঞাসা করছ! কি রকম খোলতাই চেহারাটা হয়েছে দেখতে পাচ্ছ শাদায় কাদায়। রোজ রোজ

কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে এ-চেহারা তো করতে পারব না। এ-সুবর্ণ সুযোগ অবহেলা করো না সুতরাং।

—ও কি! তুমি রাস্তায় পড়ে গেছ নাকি! কি করে?

ইলার স্বরে এবার সত্যি উদ্বেগ। কিন্তু তার বদলে সে একটু হেসে উঠলেই যেন সোমনাথের সঙ্গে আমরাও খুশি হতাম। সোমনাথের রসিকতা অবশ্য মোটা ও মামুলী ধরনের কতকটা বুঝে-শুঝেই রাখা হয়েছে মনে হয় তাকে সহজ সাধারণ দশজনের একজন বলে বোঝাবার জন্য। কিন্তু দাম্পত্য-জীবন যেখানে স্বাভাবিক সেখানে রসিকতার উৎকর্ষ বিচার করে তো হাসি উথলে ওঠে না। আনন্দের কলধ্বনি সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত, উপলক্ষ কিছু তার না থাকলেও চলে। সোমনাথের উৎসাহে উচ্ছ্বাসে ইলার সেই সহজ সাড়া যে নেই তা আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

সোমনাথ অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করে না।

ইলার উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে সোৎসাহে জানায়—কি করে পড়ে গেছি, জিজ্ঞাসা করছ? পড়েছি বেশ শাস্ত্রসম্মতভাবে পা পিছলে প্রায় একটি চলন্ত ট্রামের চাকার তলায়। খবরের কাগজে নাম ওঠার বরাতটা একেবারে রগ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

ক্যামেরা ইতিমধ্যে মেঝের জলের ধারা থেকে চোখ তুলে ইলা ও সোমনাথের মুখের ওপরেই নিবদ্ধ হয়েছে।

ইলার মুখে যেন চকিত একটা ছায়া সরে যায়। সেটা যন্ত্রণা, আশঙ্কা না বিরক্তির এবারে কিন্তু বোঝা যায় না ঠিক।

—ভিজে জামাকাপড়গুলো ছাড়বে, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই সব বাজে কথা বলবে! দাও ছাতাটা দাও দেখি। বাড়িময় তো নদী বইয়ে ছাড়লে।

—জলের বদলে অন্য নদীও বইতে পারত। বলে সোমনাথ নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে খুন হয়।

ইলা ছাতাটা অধৈর্যের সঙ্গে কেড়ে নিয়ে এবার চলে যায় পাশের বারান্দায়।

সেখানে ছাতাটা শুকোবার জন্যে মেলে দিয়ে রাখতেই সেই ঘুড়ির ছিন্ন টুকরোটা আবার দেখা যায়।

শাদা-কালোর বদলে ছবিটা আগাগোড়া রঙিন করবার উদ্দেশ্য এখানে সার্থক। লাল ঘুড়ির টুকরোটা কালো ছাতার কাপড়ের ওপরে আমাদেরও ইলার সঙ্গে চমকে দেয়। সেটা যেন সত্যিই রক্তের ছোপ।

নেপথ্যে আবার সোমনাথের ডাক শোনা যায়, ইলা! ইলা!

ইলা ঘরে গিয়ে দাঁড়াতে সোমনাথ কাতরভাবে বলে, ·আমার ড্রয়ারের চাবিটা আবার খুঁজে পাচ্ছি না যে! এসব দরকারী কাগজপত্রগুলো রাখি কোথায়?

—কেন, পাশের ড্রয়ারটা তো রয়েছে। ইলার স্বরে ঈষৎ অধৈর্য।

—বাঃ, পাশের ড্রয়ারটা তো তোমার।

—আমার ড্রয়ার হলেই বা। তোমার ওই কটা অফিসের কাগজে অপবিত্র হয়ে যাবে না। ইলার মুখে বিষণ্ণ একটু হাসি।

—কিন্তু আমি তোমার ড্রয়ারে হাত দিতেই যে চাই না। সোমনাথের গলার স্বর ঠিক কৌতুকের নয় আর।—তোমার লুকোন কিছু যদি থাকে?

—লুকোন কি থাকবে? ইলার মুখ কি একটু পাংশু দেখায় কথাটা হালকা করে বলার চেষ্টা সত্ত্বেও?

—কত কি তো থাকতে পারে! আর থাকাই তো উচিত। তুমি আমার কাছে ওই বন্ধ অদৃশ্য ড্রয়ারের মত অর্ধেক লুকোন থাকবে এই তো আমি চাই।

সোমনাথ ওইটুকু বলেই থামে না। অদ্ভুত এক আবেগের জোয়ারে ভেসে নিজেকে বোঝাবার ব্যাকুলতায় বলে চলে, তোমাকে চেনা-অচেনার আলো-অন্ধকারেই আমি রেখেছি তা কি

তুমি এতদিনেও বোঝ নি। তোমায় সামনে যেটুকু পেয়েছি সেইটুকুই আমার জানা, পেছনে কি আছে তা আমি জানি না, কোনদিন জানতেও চাইব না। মনে করে দেখ তোমার সঙ্গে এই তিন বছরের পরিচয়ের আগে তোমার কোন কথা কখনও আমি জানতে চেয়েছি কি না। তুমি কোথায় ছিলে, কি করতে, কি তোমার জীবন ছিল সে-বিষয়ে একটা প্রশ্ন তুমি আমার মুখে শোন নি একটিবারও।

—সে তোমার ঔদাসীন্যও তো হতে পারে! ইলা এখনও কি চেষ্টা করছে সমস্ত আলোচনাকে হালকা সুর দেবার! কিন্তু তার মুখের বিবর্ণতাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

—না, ঔদাসীন্য যে হতে পারে না তা তুমিও জান। এই আমার জীবনকে গ্রহণ করবার, জীবনের পরম প্রসাদ পাওয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখার ভঙ্গি। পেছনের অন্ধকারই আমার সামনের আলোকে এত তীব্র মধুর করে তুলেছে। তুমি—তুমি আমার কাছে ওই চাঁদের মত। তোমার একটা দিক কোনদিন জানব না বলেই তোমার জানা দিকটা রহস্যে বিস্ময়ে আমার কাছে এত অপরূপ। তাছাড়া আর একটা কথা বলব?

এটা সত্যিই অনুমতি চাওয়া নয়, তবু ইলার অস্ফুট স্বর শোনা যায়।—বল।

—আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগেও তুমি ছিলে এইটেই যেন আমার মন অস্বীকার করতে চায়। হয়ত এও এক রকমের ঈর্ষা, ঈর্ষা তোমার সেই জীবনের ওপর যার সঙ্গে আমি জড়িত নই। আমাদের দেখা হওয়ার পর থেকেই তোমার অস্তিত্ব আমার কাছে শুরু আমি ভাবতে চাই।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা।

হঠাৎ সে-স্তব্ধতা যান্ত্রিক আর্তনাদে ভেঙে যায়।

ফোন বাজছে। এ যেন শুধু যন্ত্রের আওয়াজ নয়, তার মধ্যে তীব্র একটা জীবন্ত আকুলতা কেমন করে মিশে গেছে।

ইলা চমকে শঙ্কিত পাণ্ডুর মুখে ফোনটার দিকে প্রায় ছুটে যায়।

কিন্তু তার আগেই সোমনাথ সেটা তুলে নিয়েছে।

—হ্যালো। হ্যালো কে আপনি! কাকে চান? কাকে?

ইলার মুখে আর কিন্তু সে-শঙ্কাব্যাকুল বিবর্ণতা নেই। সে-মুখ চরম কি পরিণামের জন্যে প্রস্তুত হয়ে এখন কঠিন হয়ে আসছে।

—হ্যালো, স্পষ্ট করে নামটা বলুন। কি, দীনেশ দস্তিদার। এখানে দীনেশ দস্তিদার কেউ নেই। রং নম্বর। বলছি রং নম্বর। মাপ করবেন, ফোনের কি দোষ হয়েছে। আওয়াজটা ঘড়ঘড় করছে। কি বললেন? কি? কি? আপনার নামই দীনেশ? দীনেশ নয় সীতেশ।

তারপরই উচ্চহাস্য।

—আরে তুই সীতেশ। বলিস কি রে? বিশ্বাসই করতে পারছি না। তুই তাহলে বেঁচে আছিস। ওঃ, যেন আর জন্মের কথা মনে হচ্ছে রে!

ইলার মুখের কাঠিন্য আবার যেন গলে যাচ্ছে, পরম নিষ্কৃতির তৃপ্তিতে না অনুভূতির দুঃসহ তীব্রতার পর উদ্‌ভ্রান্ত একটা অবসাদে।

ফোনের আলাপ তখনও চলছে।

সোমনাথ ভাল করে আলাপ করবার জন্যে একটা চেয়ার কাছে টেনে বসেছে।

—কোথায় ছিলি এতদিন? বাঃ, বেশ বলেছিস, জীবন্ত নরকে। যাক তোর সে কবি-কবি ভাব এখনও যায় নি তাহলে। একদিন আয় না। কি? কি বললি? আসবার জন্যেই তৈরি হচ্ছিস। সে আবার কি! ঘটা করে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আসবি নাকি।

এলে আমি খুশি নাও হতে পারি বলছিস। একবার পরীক্ষা করেই দেখ না। গলা ধাক্কা স্কুলের বন্ধুকে দেব না নিশ্চয়, যদিও তোর সঙ্গে স্কুলের রেষারেষিটা এখনো ভুলি নি। কিন্তু হাতাহাতি কখনও তো হয় নি। তখন হলেই ভাল ছিল বলছিস। কিন্তু হবে কি করে, বল্। তুই যা ক্ষীণজীবী ছিলি। টুসকি মারলেই ভেঙে পড়তিস। যাঃ, বাজে কথা এখন রাখ। কবে আসছিস বল্? হ্যাঁ হ্যাঁ সাহস করেই বলছি। এলে অবাক করে দেব। সে চিরকুমার-ব্রত ভেঙে ফেলেছি তা তো আর জানিস না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। ভয় পাচ্ছিস কি রে। কি বললি? আমার জন্যে ভয়। হাসালি বটে। হ্যাঁ ভাল কথা, আমার ঠিকানা পেলি কোথা? হ্যালো হ্যালো!

—হঠাৎ ফোনটা কেটে গেল কি করে?

শেষ মন্তব্যটা একটু বিস্মিত ভাবে ফোনটা নামিয়ে রাখার পর, ইলার উদ্দেশে।

ইলা কিন্তু কোথায়?

না, সে ঘরে নেই।

—ইলা!

সোমনাথ এদিক-ওদিক চেয়ে ডাকে।

—ইলা! ইলা! বাঃ কোথায় গেল এর মধ্যে।

সোমনাথ ঘর বারান্দাগুলো ঘুরে দেখে। ইলা নেই।

—আশ্চর্য তো।

সোমনাথের স্বগত মন্তব্যে যে-বিস্ময় উদ্বেগ ফুটে ওঠে দর্শকের মনেও তা তখন সঞ্চারিত। কিন্তু এ-উদ্বেগকে যেন একটু ব্যঙ্গ করবার জন্যেই ইলাকে তখন আসতে দেখা যায়।

—ডেকে ডেকে সারা হলাম। কোথায় গিয়েছিলে কোথায়?

—তোমার জন্যে কফি আনতে। ইলার হাতে কফির ট্রে-টা আগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল সোমনাথের।

—কেন, এখন আবার কফি কেন?

—ভিজে এসেছ, একটু খেলে ভালই লাগবে।

—তা বিশনকে বললেই তো পারতে।

—বিশন ছুটি নিয়ে আজ দেশে গেছে।

—সে কি! আমায় তো কিছু বল নি। যেতে দিলে কেন?

—না দিলে বিনা অনুমতিতেই চলে যেত। আজকালকার লোকজনের মেজাজ তো জান না।

—কিন্তু এখন উপায়! একটা সাহায্যের লোক না হলে চালাবে কি করে?

—যেমন করে হাজার হাজার লোক চালাচ্ছে। দুজন মানুষের সংসার চালাবার ক্ষমতা আমার নেই! আমি তো মুখে রুপোর চামচ নিয়ে জন্মাই নি।

কথাবার্তার মধ্যে টেবিলে ট্রে রেখে পেয়ালায় কফি ঢেলে সোমনাথের হাতে তা দেওয়া হয়ে গেছে।

কিন্তু কি তুচ্ছ জোলো কথাবার্তা! এই নীরস অতি সাধারণ সাংসারিক আলাপ কিছুক্ষণ আগেকার আবেগস্পন্দিত উৎকণ্ঠাতীব্র দৃশ্যের শেষে জুড়ে দেওয়ার কৌশল সমর্থন করতে পারি বা না পারি, পরীক্ষা হিসাবে তার সাহসিকতা স্বীকার করতেই হয়।

এ তো শূন্যচারী কল্পনাকে আছড়ে মাটিতে ফেলা নয়, হৃদয়-সম্পর্কের একটি বিরল সমস্যার উত্তুঙ্গ শিখর ভালো করে বোঝাবার জন্যেই প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সমতলে নেমে আসা। মনের সমস্ত তার নির্মম ভাবে টেনে বেঁধে দুঃসহ টঙ্কার তোলবার পর এমনি শিথিল করে না দিলে বুঝি ছিঁড়েই যেত একেবারে।

এমনি করে কোথাও খাদে নামিয়ে কোথাও তীব্র নিখাদে তুলে একটি সুরের বিস্তারে সমস্ত দর্শককে অভিভূত করে ফেলা হয়েছে। কাহিনী যে অস্বাভাবিক, আমাদের চারিধারের জীবনে তার প্রতিরূপ যে মেলে না বললেই হয়, তা যে সম্ভাব্যতার সীমান্ত প্রায়

ছাড়িয়ে গেছে, এসব কথা ভুলে যেতে হয় বিন্যাসের অপূর্ব মুনশীয়ানায়।

তিনটি মানুষের কাহিনী আমাদের মনোযোগ এক পলকের জন্যে শিথিল হতে দেয় না। প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে আমরা কাহিনীর জটিল আবর্ত অনুসরণ করি। সীতেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও পর্দায় তার প্রথম আবির্ভাব চমক দেয়। না, রূপসজ্জার কোন কৃত্রিম কৌশলে নয়। রূপসজ্জার বাহাদুরি যদি থাকে তো আছে বাহুল্যবর্জিত সংযমে। সীতেশের মুখের কথা শোনবার আগে শুধু তাকে প্রথম চাক্ষুষ দেখেই বুঝতে পারি কি এক তীব্র দাহ তার ভেতরটা পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। কিন্তু মৃত্যুর দিকে যা তাকে ঠেলছে তাই তাকে দিয়েছে জীবনকে তীব্র-ভাবে শেষ জানা জানবার ব্যাকুলতা।

সেই ব্যাকুলতাই কি বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে সীতেশকে প্রথম আমাদের চোখের সামনে আনবার একটু অদ্ভুত ধরনে।

দৃশ্যের পরিকল্পনাটা অবশ্য খুব নতুন কিছু নয়। বরং একটু মামুলীই বলা যায়।

সীতেশকে প্রথম ঝাপসা ভাবে দেখি একটা জানলার কাঁচের শার্সির ভেতর দিয়ে। তার সঙ্গেও বৃষ্টির দিনেই প্রথম সাক্ষাৎ। শার্সির কাঁচ বৃষ্টির ছাটেই ঝাপসা। বৃষ্টির ফোঁটা তার ওপর সরাসরি পড়ছে না। মাঝে মাঝে দু-একটা ছিটে গিয়ে লাগছে মাত্র। সেই ছিটে লেগে জমে থাকা ফোঁটাগুলো এখানে-ওখানে থেকে থেকে নতুন ছাটে পুষ্ট হয়ে সুতুলি-ধারায় এঁকে-বেঁকে নেমে যাচ্ছে। পেছনের একটা ঝাপসা মুখ তাইতে অদ্ভুত আকার নিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। সে-মুখটা যেন কঠিন বাস্তব কিছু নয়। তরল একটা অনির্দিষ্ট কল্পনা। কি আকার নেবে এখনও স্থির করতে পারে নি।

সেই তরল মুখের কল্পনাটা কিছুক্ষণ বাদে ক্ষুধিত ব্যাকুল দুটো চোখ হয়ে ওঠে শার্সির একেবারে কাছে এগিয়ে এসে। চোখ দুটো

প্রায় শার্সির গায়ে লাগানো। অসীম আগ্রহে বাইরের কি যেন সে দেখতে চাইছে, কিন্তু মাঝখানে কাঁচের জানলার বাধা। তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল শার্সির ওপর দিয়ে গড়াচ্ছে। চোখের দৃষ্টিতে ব্যাকুলতার সঙ্গে সেই একটা দুর্বোধ দাহ না মিশে থাকলে সে-জলের ধারাকে অশ্রুর রূপক বলে মনে করা যেত।

হঠাৎ সবেগে কাঁচের জানলা ঝনৎকারের সঙ্গে খুলে যায়। আমরা শীর্ণ রুগ্ন অথচ কি এক দুর্বোধ দীপ্তিতে উজ্জ্বল একটা মুখ দেখি জানলায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

তারপর কার দুটি হাত কাঁচের জানলার পাল্লাগুলো আবার ভেতর থেকে টেনে বন্ধ করে দেয়। হাত দুটি নিরাভরণ হলেও সুগঠিত নখরতায় বুঝিয়ে দেয় যে তা কোন পুরুষের নয়।

জানলার ওধারে যাবার সুযোগ আমরা এবার পাই।

পরিচ্ছন্ন একটি প্রশস্ত ঘর। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই বললেই হয়। জানলার ধারের একটি খাটে বালিশ হেলান দিয়ে সীতেশ অর্ধশায়িত।

জানলার পাল্লা যে বন্ধ করেছে সেই মেয়েটিকেও এবার দেখা যায়। শুধু হাত দুটি দেখে যা বুঝতে পারি নি, মার্কামারা পোশাক না থাকলেও বেশবাসের বিশেষ ধরনে ও কথাবার্তা চলাফেরার ভঙ্গিতে তা এবার বুঝি।

মেয়েটি নার্স। বয়স খুব অল্প নয়। সুশ্রীও বলা চলে না, কিন্তু তবু কেমন একটু স্নিগ্ধতা আছে সব কিছু জড়িয়ে।

—আপনার বেডটা আবার জানলা থেকে সরিয়ে আনব এরকম অন্যায় যদি করেন। এবার কোন কাকুতি-মিনতি শুনব না।

নার্সের কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ হলেও তাতে দৃঢ়তা আছে।

সীতেশের চোখের দৃষ্টিতে এখন ক্ষুধিত ব্যাকুলতার ওপর কৌতুকের একটা পাতলা পর্দা ঈষৎ ঝলমল করছে।

—দেখলাম তুমি হুঁশিয়ার আছ কি না। আচ্ছা তোমার

এক-আধবার বিরক্তি ধরে না, ইচ্ছে করে না একটু গাফিলি করতে।

—গাফিলি করবার জন্যে কি মাইনের টাকা নিই?

—আহা মাইনের টাকা তো দুনিয়া শুদ্ধ নিচ্ছে। গাফিলি করছে না তবু কে? গাফিলি করলেও মাইনে পাবে। উপরির ব্যবস্থা করা যাবে বরং।

—আপনার ওসব আবোল-তাবোল কথা শোনবার সময় আমার নেই। কাজ আছে। নার্স চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

—আহা যাচ্ছ কোথায়? আবোল-তাবোল শোনাও একটা কাজ। আবোল-তাবোল বলে যদি তোমার রুগীর মন প্রফুল্ল থাকে, তাও তোমায় শুনতে হবে।

—বেশ শুনছি তাহলে। নার্স একটু হেসে বিছানার কাছে একটি চেয়ার টেনে বসে একটু মিনতির সুরে বলে, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। বেশি কথা বলা আপনার পক্ষে অন্যায় তা জানেন!

—জানি না আর। আমার বেঁচে থাকাও তো অন্যায়।

নার্স ওঠবার উপক্রম করতেই সীতেশ আবার বলে ওঠে, আহা উঠ না উঠ না, অন্য কথা বলছি এবার। আচ্ছা কতদিন এমনি সেবা করছ বল তো?

—হিসেব করে রাখি নি।

—আমি রেখেছি। সবশুদ্ধ পনেরো মাস হতে চলল। পনেরো মাস ধরে একটা রুগীকেই নাড়াচাড়া করে তোমার অরুচি ধরে যায় না একঘেয়েমিতে? সেবার দিক দিয়েও মুখ বদলাতে ইচ্ছে করে না? নতুন নতুন রোগী হলে অন্ততঃ একটা বৈচিত্র্য তো পাওয়া যায়।

—গল্প উপন্যাস নাটক লেখার রসদ যোগাড় করতে তো একাজ করি না। এক আর অনেক আমাদের কাছে সব সমান।

—এটা সেরেফ তোমাদের নীতিশাস্ত্রের মুখস্থ বুলি হ'ল। অনেকের মধ্যে এক অদ্বিতীয় হয়েও তো ওঠে কখন-কখন। ধর তোমার সঙ্গে আমার একটা ভালবাসাও তো গড়ে উঠতে পারত এতদিনে। সে-ভালবাসা যাকে বলে যৌন আকর্ষণের দেখেই-মোহিত-হওয়া নয়। তোমার বেলায় সে-ভালবাসা জাগত করুণা থেকে আর আমার বেলা কৃতজ্ঞতায়। মনে হয় হঠাৎ বন্যায় যা ভাসায় তার চেয়ে সে-ভালবাসার ভিত অনেক পাকা।

—হয়ত তাই। কিন্তু তা হবার নয়। আমি বয়সে আপনার চেয়ে বোধহয় বড়ই হব, আর তার উপর বিবাহিত।

সীতেশ কৌতুক-কুঞ্চিত মুখে কিছুক্ষণ নার্সের দিকে চেয়ে বলে, ভালবাসা হওয়ার বিরুদ্ধে এ-দুটো কোন যুক্তি হ'ল?

—আমার কাছে হ'ল।

—হ্যাঁ যুক্তি হিসেবে। কিন্তু জীবন কি যুক্তি মানে। যুক্তি কি তোমাদের ওই হাত ধোবার জীবাণুনাশক সাবানের মত, হৃদয়টাকে তা দিয়ে ধুইয়ে দিলে একেবারে সব রোগের বীজ নষ্ট হয়ে যায়!

—জানেন তো আমি মুখ্যু মেয়েছেলে। ওসব শক্ত কথা বুঝি না।

—বেশ। যা বুঝতে পার এমন নরম কিছু বলি, শোন। একটা রূপকথার গল্প।

—এখন রূপকথার গল্প শোনার সময়!

—রূপকথার কি সময় অসময় আছে। তা শোনবার বয়সও কিছু বাঁধাধরা নেই। গাছ যেমন শেকড় গুড়ি ডালপালা পাতায় ছড়িয়ে শেষপর্যন্ত ফুলের ভেতর দিয়ে মধু আর সুগন্ধের নির্যাস তৈরি করে, আমরাও তেমনি সবাই কোন এক রূপকথার উপাদান যুগিয়ে যাচ্ছি। ধৈর্য ধর। ভূমিকাটা ভারী হলেও গল্প খুব ছোট। সেই রাজপুত্র আর রাজকন্যার গল্প। তবে রাজপুত্র এক নয় দুই। মনে কর সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে সাতশ

রাক্ষসীর প্রাণ-ভোমরা মেরে, 'হাসলে মানিক কাঁদলে মুক্তো' রাজকন্যাকে উদ্ধার করে বিয়ে করে রাজপুত্র দেশে ফিরছে ময়ূরপঙ্খী ডিঙায়। দুধ-সাগর মধু-সাগর পেরিয়ে হঠাৎ দধি-সাগরে উঠল কাল তুফান। হাল ভেঙে পাল ছিঁড়ে ময়ূরপঙ্খী ডিঙা গেল তলিয়ে। রাজকন্যেকে পিঠে নিয়ে রাজপুত্তুর সেই প্রলয়ের আথালি-পাথালি সমুদ্দুর সাঁতরে উঠল গিয়ে এক অচিন কূলে। জনমনিষ্যিহীন দেশের ধু-ধু করছে চারদিক। গলা ভেজাবার জলটুকুও নেই। রাজপুত্তুর বললে, এখানে দু-দণ্ড তোমায় একলা থাকতে হবে রাজকন্যা, আমি আর কিছু না পারি পিপাসার জল নিয়ে আসি। রাজপুত্তুর গেল জল আর অন্ন খুঁজতে। কিন্তু দিন গেল রাত গেল না মেলে অন্ন না জল। খাঁ-খাঁ দেশের সীমানায় না-না। মানার পাহাড়। সেই পাহাড় পাহারা দেয় এক যক্ষী বুড়ি। বুড়ি বললে, জল দিতে পারি যদি চোখ দাও একটা। আর অন্ন? অন্ন দেব আরেক চোখ পেলে। দু-চোখ দিলে তো অন্ধ। তাই রাজপুত্তুর রফা করল এক চোখের বদলে গলার স্বর দিয়ে। অন্ন আর জল নিয়ে ফিরল কানা আর বোবা হয়ে সেই সাগরকূলে। কিন্তু কোথায় রাজকন্যা! হাহা করছে বাতাস, আছড়ে-পিছড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে সমুদ্দুরের ঢেউ। রাজকন্যা নেই। হন্যে হয়ে খুঁজতে খুজতে পেল একটি নিটোল মুক্তো—চড়ার বালিতে চিক্‌চিক্ করছে। এই তো রাজকন্যার চলে যাওয়ার সাক্ষী। রাজকন্যে তাহলে চোখের জল ফেলেছে। সেই মুক্তো কুড়িয়ে নিয়ে রাজকন্যের খোঁজে কত দেশ কত রাজ্যি পার হয়ে যায় কানা-বোবা রাজপুত্তুর। তাকে পথ চেনায় যেতে-যেতে কুড়িয়ে-পাওয়া অমনি এক-একটি মুক্তো।

—অনেকক্ষণ কথা বলেছেন। আর নয়। এবার থাক! নার্সের গলায় এবার আদেশের সুর।

—গল্প এইখানে থামাতে বলছ! সীতেশের চোখ দুটো যেন

জ্বলে ওঠে। —জানতে চাও না কোথায় গেল রাজপুত্তুর? কি হল তার? শোন আরেকটু, রাজপুত্তুর মুক্তোর নিশানা দেওয়া পথ ধরে যেতে যেতে একদিন যেন সাপের ছোবল খেয়ে নিথর পাথর হয়ে যায়। মুক্তো নয় মুক্তো নয়, এবার পথের নিশানা মানিক। শুধু পথে নয়, যে-রাজ্যে তখন পৌঁছেছে তার যেদিকে চায় শুধু মানিক। এ কার রাজ্য? কার রাজ্যে মানিকের এত ছড়াছড়ি—রাজকন্যের রাঙা হাসির মানিক?

—জান সে কার রাজ্য? সীতেশ একটু চুপ করে থেকে অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে জিজ্ঞাসা করে নার্সকে।

নার্স কঠিন হয়ে কি বলতে চায় কিন্তু তাকে হাসির বেগেই নীরব করে দিয়ে সীতেশ বলে, সে-রাজ্য বোবা-কানা রাজপুত্তুরেরই এক মিতার। ছেলেবেলার এক সাঙাতের। তখন বোবা-কানা রাজপুত্তুর কি করবে জান?

—না জানি না। নার্সের গলার স্বর গম্ভীর।—কিন্তু ফোনটা আমি এঘর থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি ডাক্তারবাবুকে বলে, এইটুকু শুধু আপনাকে জানিয়ে গেলাম।

সীতেশ কি তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে অস্থির হয়ে?

না, সেরকম কিছুই করে না। বরং বিশেষ কোন আগ্রহ না দেখিয়েই জিজ্ঞাসা করে, কেন বল তো?

—আমি সব সময়ে পাহারা দিয়ে এখানে থাকতে পারি না বলে। নার্সের গলার স্বর প্রায় যান্ত্রিক।

সীতেশ একটু অদ্ভুতভাবে এবার হেসে বলে, না, ফোনটা এঘর থেকে সরিয়ে দেবার আর দরকার নেই। পাহারা না দিলেও ও ফোন আর কোথাও কারুর শান্তি ভঙ্গ করবে না। কিন্তু কানা আর বোবা রাজপুত্রের গল্প তোমায় আর একটু শুনতে হবে।

—শুনব। বলে নার্স ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমাদের চোখের সামনে শার্সি দেওয়া জানলাটাই শুধু থাকে সীতেশের পাশ

থেকে দেখা মুখের আকারটুকুর সঙ্গে। জলের ছাঁট কাঁচের ওপর মুক্তাবিন্দুর মত এখনো সুতলি জলের ধারা হয়ে গড়িয়ে যায়, শুধু সীতেশের মুখটাই আঁকা-ছবির মত স্থির স্তব্ধ একাগ্র।

যে-ক্যামেরা জায়গায় জায়গায় ইতিপূর্বে দর্শকের চোখকে চরকিবাজি দেখিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়েছে, তাই এই দীর্ঘ দৃশ্যের মাঝে একেবারে নিষ্পলক ভাবে শেষ কটি মুহূর্তের আগে পর্যন্ত যেন চমক ভাঙবার ভয়ে এক জায়গায় অচল হয়ে থেকেছে, সাধারণ দর্শক তা ঠিক খেয়াল করে বলে মনে হয় না। চিত্রস্রষ্টাদের এখানেও একটা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় আছে বোধহয়। ক্যামেরা সচল বলেই তাঁরা অকারণে তাকে ঘুরপাক খাওয়ান নি, হাতে কাঁচি আছে বলেই চালিয়ে বসেন নি যেখানে-সেখানে। ছবি যখন দেখবার আমরা আশ মিটিয়ে দেখেছি, শোনবার কথাও শুনেছি ক্যামেরার কোন চাতুরীতে দোমনা না হয়েই।

খুব দীর্ঘ ছবি নয়, কিন্তু আসলে তিনটি কিংবা নাস কে নিয়ে বলা যায় সাড়ে তিনটি মানুষের এই ত্রিকোণ কাহিনী আমাদের এমন অমোঘ ভাবে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে সেই শেষ পরিণতির দিকে যে সময়ের গতি আমাদের কাছে আপেক্ষিক হয়ে গেছে।

সেই শেষ পরিণতি, খবরের কাগজে যা ডবল কলম শিরোনামা দিয়ে সস্তা উত্তেজনায় ফেনিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল।

কি যেন ছিল ভাষাটা?

কিন্তু খবরের কাগজের বিবরণের সঙ্গে 'ঝটিকা' ছবিটির উপসংহার মেলানো একটু কঠিন।

নামে 'ঝটিকা' হলেও ছবিতে সেই বস্তাপচা মেঘের গুলতানি আর ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের চমক কোথাও দেখা যায় নি। সেই নারকেল গাছের নুয়ে-পড়া মাথার মামুলী শট্-এর সঙ্গে প্রপেলারে সাজানো সেটের খোড়ো চাল ওড়ার দৃশ্য জোড়া হয় নি কোথাও।

বৃষ্টি ছাড়া সত্যি কথা বলতে গেলে ঝড়ই কোথাও নেই সারা ছবিতে। ঝড় যা রয়েছে তা কটি হৃদয়কে ঘিরে শুধু।

শেষ দৃশ্যে পর্যন্ত ঝড়ের কোন চিহ্ন নেই।

যা আছে তা ঝিরঝিরে বৃষ্টি, মিহি জালের পর্দার মত যা রাত্রের শহরকে আর একটু নিবিড় রহস্যের আবরণ দিয়েছে।

রাস্তার যে-আলোর তলায় সোমনাথের খোলা ছাতির মাথায় এক রাত্রে ভিজে ছেড়া ঘুড়ির টুকরো পড়তে দেখেছিলাম সে-খানেই আজ একটি ট্যাক্সি থামল এসে।

বর্ষাতি-ঢাকা হলেও তা থেকে সোমনাথ আর ইলাই নামল বুঝতে পারলাম। কথাবার্তায় এটাও বোঝা গেল যে তাদের এটা বিয়ের তারিখ। তাই উৎসব করতে তারা বাইরের কোন হোটেলে দুচারটি বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সেরে আসছে।

বাইরের দরজার তালা খোলার চেষ্টা দেখে ছুটি-নেওয়া বিশন এখনো দেশ থেকে ফেরে নি তাও অনুমান করা গেল। বাড়ির বদলে হোটেলে বিবাহ-বার্ষিকী উৎসব করার কারণও বোধহয় তাই।

কিন্তু এ কি! সোমনাথ বিস্ময়ে আশঙ্কায় প্রায় চিৎকার করে উঠল, দরজার তালা যে ভাঙা!

—ভাঙা? ইলা এগিয়ে গেল উদ্বিগ্ন ভাবে।

হ্যাঁ, ভাঙা না হোক তালাটা খোলা। সোমনাথ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাড়ির ভেতরে ছুটে যেতে যেতে বললে, সর্বনাশ হয়ে গেছে নিশ্চয়।

নিচের উঠোনের আলোটা জ্বলে উঠল। তারপর সিঁড়ির, তার ওপরের দালানের, তাদের বসবার শোবার ঘরের।

সোমনাথ উত্তেজিত ভাবে স্টীল আলমারির হাতলটা ঘোরাল। না, আলমারী বন্ধই আছে। টানল পর পর দেরাজের সব কটা ড্রয়ারই। না—সেগুলোও চাবি দেওয়া।

ইলা পাংশু মুখে পেছনে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। সোমনাথ একটু

যেন রূঢ় স্বরেই ধমক দিলে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কি? ওয়ার্ডরোব আর কাপড়ের ট্রাঙ্কগুলো দেখ।

ইলা যন্ত্রচালিতের মত গেল সে-আদেশ পালন করতে।

সোমনাথ অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে দেখতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

—ইলা! ইলা! ডাকটা কিন্তু কেমন বিমূঢ়।

ইলা ঘরে এসে দাঁড়িয় বললে, না, ট্রাঙ্ক ওয়ার্ডরোব আলমারি সব ঠিক আছে।

—হুঁ, কিন্তু ওই বুককেসটার দিকে চেয়ে দেখ। সোমনাথ চুপি চুপি যেন সভয়ে আঙুল তুলে বললে, আমাদের বাঁধানো ফটো জোড়ার পাশে ওই ফুলদানিটা দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ ওতে কি ফুল? আমি তো রজনীগন্ধা এনে দিয়েছিলাম, ও-ব্ল্যাক প্রিন্স ওখানে কে রাখল?

স্বপ্নাবিষ্টের মত ইলা এগিযে গেল বুককেসটার দিকে। ফুলদানিটার দিকে চেয়ে রইল বিমূঢ় আচ্ছন্ন ভাবে।

—তুমি! তুমি কি আনিয়েছ ও ফুল? কখন আনালে? কাকে দিয়ে?

সোমনাথ কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে তীব্র চাপা স্বরে।

—না, আমি আনাই নি! ইলার কথাগুলো প্রায় অস্ফুট।

—তবে? সোমনাথ বিহ্বলভাবে ইলার দিকে তাকাল, তারপর হঠাৎ বুককেসটার ওপর কি-একটা দেখতে পেয়ে তুলে নিল দু-আঙুলে।

—এটা কি? এ-মুক্তো কোথা থেকে এল? তোমার! না তোমার আসল নকল কোন মুক্তোর মালা তো নেই। তুমি মুক্তো পছন্দই কর না বল। তবে? তাহলে এ-মুক্তো কোথা থেকে···

সোমনাথের গলার স্বর ধাপে ধাপে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে একটা আর্ত জিজ্ঞাসায় মিশে যেতে গিয়ে বাধা পেল হঠাৎ।

মেঝের দিকে চেয়ে প্রায় আতঙ্কের স্বরে সে বলে উঠল, ওই তো আরেকটা। আর ওই! ওই!

মাথা নিচু করে ঘরময়-ছড়ানো মুক্তোগুলো সোমনাথ যখন অপ্রকৃতিস্থের মত খুঁজছে তখনই ফোন বেজে উঠল হঠাৎ।

—ধর ফোনটা। সোমনাথ মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আদেশ দিলে।

কিন্তু ইলা নড়ল না। সেই আগেকার মতই অস্ফুট স্বরে বললে, না, তুমিই ধর।

একটু অবাক হয়ে ইলার দিকে তাকিয়ে সোমনাথ অপ্রসন্ন মুখেই ফোনটা গিয়ে ধরল।

—হ্যালো! হ্যাঁ, আমিই সোমনাথ সরকার কথা বলছি। কি? কি বললেন? সীতেশ দস্তিদার এখানে এসেছে কি না? না, না, সীতেশ কোথা থেকে আসবে? তাকে পনের বছর চোখে দেখি নি। একদিন ফোন করেছিল। কে আপনি? নার্স? নার্স! সীতেশ অসুস্থ! ভয়ঙ্কর অসুস্থ! মৃত্যুশয্যা থেকে পালিয়ে এসেছে! আমারই বাড়িতে এসেছে ঠিক জানেন? কিন্তু? কিন্তু ··

ফোনটা হাতে ধরেই সোমনাথ চিৎকার করে উঠল, ইলা! ইলা! কোথায় যাচ্ছ!

ফোনটা টেবিলের ওপরই ফেলে ছুটে গিয়ে সোমনাথ ইলাকে সিঁড়ির ওপর ধরল।

—কোথায় যাচ্ছ ইলা! কোথায়?

—বাধা দিও না। আর সময় হয়ত নেই। তবু তাকে খুঁজে পেতেই হবে।

—কাকে? কাকে? সীতেশকে? সীতেশকে তুমি চেন? কোথায়? কেমন করে?

ইলার পিছু পিছু সোমনাথ তখন বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে

এসেছে, যে-রাস্তায় ঝিরঝিরে বৃষ্টির পাতলা রহস্য-গুণ্ঠন সব কিছুর অর্থ বদলে দিয়েছে।

রাস্তার সেই বাতির নিচে ইলা একটিবার দাঁড়াল। তারপর কাতর ক্ষুণ্ন স্বরে বললে, পারলে না তাহলে আধেক আড়াল রেখে দিতে। শোন তবে। সীতেশ আমার জীবনে এসেছে চাঁদের সেই উলটো পিঠে, যে-পিঠ আমি আরেক জন্মে ফেলে এসেছি ভেবেছিলাম, কোনদিন যার ছায়া এ-জগতে এসে পৌঁছবে বলে কল্পনা করতে পারি নি। সে-ছায়ার অস্তিত্ব টের পেয়েও অভিশাপের মত আমি তাকে এ-জীবন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছি, কিন্তু সে নিজেই আজ নিজেকে মুছে দিয়ে চলে গেল। তাকে শেষবার আমায় খুঁজে বার করতেই হবে তাই।

তারপর বিষন্ন বৃষ্টি-ভেজা শহরে কত পথই না তারা ঘুরে বেড়ায়। অনেক অনেক পরে আকাশ বাতাস প্রসন্ন থাকলে শহরের সুখী নাগরিকেরা যেখানে স্বাস্থ্য কামনার ছলে বিচরণ করতে আসে তেমনি এক অধুনা নির্জন রাস্তার ধারে পাতা একটি বেঞ্চে প্রায়-লুটিয়ে-পড়া যে-মূর্তিটিকে দেখা যায় সেই কি সীতেশ?

ঝিরঝিরে বৃষ্টির গুণ্ঠন যেন সরাতে সরাতে ব্যাকুল ভাবে দুজনে সেদিকে এগিয়ে যায়।

ক্যামেরা আর তাদের অনুসরণ করে না। সীতেশকে পাওয়া না-পাওয়ার অনিশ্চয়তার ওপরেই পর্দা অন্ধকার হয়ে আসে শেষবারের মত।

খবরের কাগজে যে-ঘটনার বিবরণ ছিল তা-ই এ-কাহিনীর বীজ বলে মানতে এখন অবশ্য মন চায় না।

ডবল কলম শিরোনামাগুলো এখন স্মরণ হচ্ছে,—বাতিল স্বামী, ফেরারী স্ত্রী। তারপর—স্বামী বাহুল্যের বিচিত্র সমাধান। সব শেষে, দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে হুলস্থুল!

খবরের কাগজে রসিয়ে-রসিয়ে যে-কাহিনী বলা হয়েছিল তা এখানে তুলে দিতে পারতাম, কিন্তু তার চেয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণই দেওয়া বোধহয় ভাল। বিশেষ প্রত্যক্ষদর্শী আমি যখন নিজেই।

হ্যাঁ, সেদিন বিকেলে হবে-হবে করে ঠেকিয়ে-রাখা দাঁত দেখানোটা আর এড়িয়ে যাওয়া যায় নি ব্রহ্মরন্ধ্র-ভেদ-করা যন্ত্রণায়। ডাঃ ঘোষ রায়ের প্রতীক্ষাগারে আমারই মত গুটি দশেক হতভাগ্যের সঙ্গে যে যার নিজের জ্বালায় মরছি—এমন সময় সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ডাক্তারের সহকারী পর পর এক-একজনকে নাম ধরে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন আর আমরা ইষ্টদেবতা স্মরণ করে কজন বাকি রইল গুনছি।

মাত্র জন পাঁচেক যখন বাকি তখন সহকারীর ডাকে একজোড়া চিকিৎসার্থীকে উঠতে দেখে আশ্বস্ত হলাম। বুঝলাম হয় স্ত্রী নয় স্বামীর বিপদে সাহস দিতে অপরপক্ষ সঙ্গে এসেছেন মাত্র।

স্বামী-স্ত্রী ভেতরের দিকে পা বাড়িয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্তে সদ্য-দাঁত-তুলে-আসার বীরত্বব্যঞ্জক মুখ নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে এক ভদ্রলোক হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।

তারপর সেই দম্পতির কাছে গিয়ে মেয়েটিকে উদ্দেশ করে সবিস্ময়ে বললেন, একি? রেবা তুমি

মেয়েটির মুখের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে তার স্বামীর ইলেকট্রিক ট্রেনের হুইস্‌লের মত তীক্ষ্ণ স্বরে চমকে উঠলাম।

—কি রকম অভদ্র লোক মশাই আপনি! রেবা-রেবা করছেন কাকে?

—এই ওঁকে! দাঁত-তোলানো ভদ্রলোকের বাজখাঁই গলা শোনা গেল। —যিনি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে।

—খবরদার! মুখ সামলে কথা বলবেন! সরু চাঁছা গলা এবার

প্রায় চিরে যাবার উপক্রম।—জানেন উনি কে? উনি আমার স্ত্রী। রেবা-টেবা নয়, ওঁর নাম অমলা।

—অমলা! স্ত্রী বলে আমায় অমলা দেখাচ্ছেন! দাঁত-তোলানো ভদ্রলোক গর্জে উঠলেন।

—হ্যাঁ দেখাচ্ছি। মিহি হুইস্‌ল চড়া সুরে বাজল।—আর দাঁতের বদলে চোখের চিকিচ্ছে করাতে বলছি। পরের স্ত্রীকে উনি রেবা দেখছেন। এখুনি পুলিস ডাকতে পারি জানেন?

—পুলিস ডাকবেন আপনি! তার বদলে আমিই ডাকছি। দাঁত-তোলানো ভদ্রলোক মিলিটারি হুঙ্কার ছাড়লেন।—দেখি ইনি আপনার অমলা না আমার রেবা।

—আপনার রেবা? আমার স্ত্রী অমলা আপনার রেবা! হুইস্‌ল যন্ত্রণায় ফোলা গালটা চেপে ধরে আমাদেরই সাক্ষী মানলেন কাঁদুনে চিৎকারে।—দেখেছেন মশাই। দেখেছেন বদমায়েসটার আস্পর্ধা!! আমার স্ত্রীকে বলে কি না ওর রেবা।

দাঁতের যন্ত্রণা ভুলে আমরা অবশ্য তখন এই তাজ্জব ব্যাপারে হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। চেম্বার থেকে স্বয়ং ডাক্তার ঘোষ রায় আর তাঁর লোকজনও এসে পড়েছে গোলমাল শুনে।

—কি ব্যাপার কি? চেঁচামেচি কিসের! ডাঃ ঘোষ রায়ই কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলেন এগিয়ে এসে।

—কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার ফোনটা দয়া করে একটু ধরতে দিন। লালবাজারকেই জানাচ্ছি।. দাঁত-তোলানো ভদ্রলোক অনুমতিটা পেয়েছেন বলেই ধরে নিয়ে বীর বিক্রমে ভেতরের দিকে চললেন।

বাধা দিয়ে ডাঃ ঘোষ রায় বললেন, লালবাজারের আগে আমাকেই একটু জানান না।

—জানাব কি মশাই! দাঁত-তোলানো ভদ্রলোক ফেটে পড়লেন। —এখনো বুঝতে পারছেন না। জালিয়াত জোচ্চোর সব শয়তান।

দলিল দস্তাবেজ নয়, একেবারে বউ-জাল এদের কারবার, বুঝেছেন! এই, এই গালফুলো ভদ্রলোক স্ত্রী সাজিয়ে যাকে এনেছেন তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে মশাই এই দু-বছর আগে। দস্তুরমত অগ্নিসাক্ষী করে মন্ত্র-পড়া বিয়ে। সেই বিয়ের পর ফুলশয্যার রাত্রেই বউ উধাও। আজ এতদিন বাদে এই এখানে হঠাৎ ধরে ফেলতে এই গালফুলো বলে কি না তার বউ। লালবাজারে খবর দিন মশাই, এখুনি খবর দিন।

—তাই দিন না! হুইস্‌ল-এ আবার কানে প্রায় তালা লাগার উপক্রম।—দেখাই যাক না কার বউ। দু-বছর আগে উনি বিয়ে করেছেন। দু-মাস আগে, বুঝেছেন, দু-মাস আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। চান তো সাক্ষী সাবুদ সব হাজির করছি।

—আচ্ছা তা না হয় করবেন। ডাঃ ঘোষ রায় প্রশ্ন করলেন, কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত গণ্ডগোল তাঁকেই একটু ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করলে হত না। তাঁকেই একটু সামনে ডাকুন না।

—হ্যাঁ ডাকুন! মিহি মোটা দুই গলাই একমত।

—কই, এস রেবা। মোটা গলার ডাক তারপর।

—এস না অমলা। তোমার ভয় কি! মিহি গলায় আশ্বাস।

কিন্তু রেবা বা অমলা যিনিই হন, তিনি কোথায়?

গোলমাল দেখে ভয়ে ভেতরের চেম্বারের দিকে?

না।

বাইরের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন?

সেখানেও নেই।

বাড়িতে ফিরে গেছেন গালফোলা ভদ্রলোকের?

না, সেখানেও ফোন করে জানা গেল যে যান নি।

শেষ পর্যন্ত লালবাজারেই ফোন করলেন ডাঃ ঘোষ রায়।

বর্ণনা শুনে তাঁরাও ওই একটি মেয়েরই খোঁজে আছেন।

জানালেন। ইতিমধ্যে গুটি পাঁচেক শ্বশুরবাড়ি সে নাকি শোক-সাগরে ভাসিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

দাঁতভোলা ও গালফোলা ভদ্রলোকরা এবার ফ্যালফ্যাল করে পরস্পরের দিকে চাইলেন।

—আমি যে আজই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এখানে আসছি। মিহি গলা কাতরে উঠলেন। —সব ওর ব্যাগে ছিল। তার ওপর নতুন গয়নার সেট।

—আমারও গয়নার সেটের ওপর ফুলশয্যার রাত্রে পাওয়া সব দামী উপহার একটি সুটকেশ সমেত। মোটাগলা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,আপনার সঙ্গে কোথায় আলাপ?

—স্ট্র্যাণ্ড রোডে মশাই, প্রিন্সেপ্‌স ঘাটের কাছে।

—আমার ওই কাছাকাছিই ইডেন গার্ডেনসে।

ওই পর্যন্ত শোনার পর আমাদের দাঁতের ব্যথা আবার চাড়া দিয়ে ওঠায় মিহি-মোটার জীবন-নাট্যে আর উৎসুক থাকতে পারলাম না।

সত্যিকার উপসংহারটুকু দিতে গিয়ে ছায়াছবির অমন উপাদেয় কাহিনীটিকে সংহারই করলাম কি না বুঝতে পারছি না। তাই করে থাকলে লেখক ও পরিচালকের মুগ্ধ ভক্তবৃন্দের কাছে করজোড়ে মার্জনা চাইছি।

এখন আর ফেরা যায় না।

সামনেও যতখানি, ফিরে গেলে পেছনেও ততখানি পথ।

কিন্তু সত্যিই যদি মাথা ঘুরে রাস্তার মাঝে পড়ে যায়। কি কেলেঙ্কারিটাই হবে! মাথাটা রীতিমত ঝিমঝিম করছে। কোথাও এতটুকু ছায়া পেলে বেঁচে যেত। এ-পোড়া রাস্তায় একটা গাছ ত দূরের কথা বিজলী বাতির পোস্টে একটা বিজ্ঞাপনের কিয়স্কও নেই যার আড়ালে একটু দাঁড়ান যায়।

পুব পশ্চিমের রাস্তা। সবে বস্তি অঞ্চল তুলে তৈরি হচ্ছে। দুধারে দূরে দূরে টিন কি খাপরার চালের কুঁড়ে। আশ্রয় নেবার মত বারান্দা গোছের কিছু এ-অঞ্চলে মেলবার নয়।

বাড়ি থেকে না বার হলেই অবশ্য পারত। বেরুনটাই তখন ভুল হয়েছিল। রোদের তেজ যে কি তা' ত দরজাটা খুলতেই টের পেয়েছিল। চোখমুখ ঝলসে গেছল আগুনের ঝাপটায়। রোদ নয় যেন হিংস্র একটা আক্রোশ।

তখনই মনে হয়েছিল না গেলে হয় না? আজ যে-জন্যে যাওয়া সে-উদ্দেশ্য না গিয়েও এক দিক দিয়ে ত সিদ্ধ হতে পারে!

কি করবে বিজয়? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। হতাশ হয়ে পায়চারি করবে এদিক-ওদিক। বাড়ি পর্যন্ত ত আসতে পারবে না। নতুন ঠিকানা তাকে জানান হয় নি। ঠিকানা যদি লুকিয়ে জেনেও নিয়ে থাকে এর মধ্যে, তবু সাহস করবে না আসতে। তিনটের পরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সাড়ে-তিনটে কি চারটে নাগাদ ওই পেট্রল পাম্পের লোকেদের সন্দেহ জাগাবার ভয়ে শেষে বাধ্য হবে চলে যেতে।

ক্ষুব্ধ অপমানিত বোধ করে তাতেই যদি সম্পর্ক চুকিয়ে দেয় বিজয়, তাহলেই ত সব সমস্যা সহজে মিটে যায়।

নিজের মুখে স্পষ্ট করে কথাগুলো তাহলে আর বলতে হবে না। সে-বলার যন্ত্রণার চেয়ে তাকে ভুল বুঝে বিজয়ের চিরকালের মত সরে যাওয়ার বেদনাও বুঝি সহনীয়।

কিন্তু বিজয় যাই বুঝুক এই কথার খেলাপে সম্পর্ক চুকিয়ে যে দেবে না তা শুভা জানে।

বিজয় অভিযোগ অনুযোগ কিছুই করবে না পরের দিন অফিসে দেখা হবার পর। টিফিনের সময় সুযোগ পেলে শুধু সেই শান্ত গাঢ় চোখ তার দিকে তুলে একটু হেসে বলবে, কাল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি!

শুভাকে যাহোক একটা কৈফিয়ত তখন দিতে হবে। অবিশ্বাস্য কৈফিয়ত দিলেও বিজয় তা নীরবে মেনে নেবে কোন প্রশ্ন না তুলে।

না, বিজয়কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছু বোঝানো যাবে না। যা বলবার তাকে স্পষ্ট করেই বলতে হবে সোজাসুজি। তাতে তার যতখানি আঘাত লাগে লাগুক।

আজ সেই জন্যেই বিশেষ করে না গেলে নয়।

রোদের তেজ দেখে আবার ভেতরে গিয়ে ছাতিটা খুঁজতে খুঁজতে শুভা এসব কথা ভেবেছিল।

ছাতিটা খুঁজে পেয়েও কিন্তু নিতে পারে নি। হাতলটা চিড় খেয়ে কাপড়ের রঙ জ্বলে গিয়ে যা চেহারা হয়েছে, ওটা নিয়ে অন্তত সিনেমা হলে ঢোকা যায় না। সাজপোশাক এমন কিছু বাহারে তার নয়, কিন্তু ছাতাটা যেন দৈন্যদশার মূর্তিমান প্রতীক হিসাবে সে-সাধারণ বেশভূষার সঙ্গেও বেমানান।

ছাতা না নিয়েই তাই বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু খানিক বাদেই মনে হয়েছে সস্তার খাতিরে সুদূর শহরতলিতে যাদের এমন বাসা নিতে হয় যে ক্রোশখানেক না হাঁটলে সভ্যভব্য পাড়ার নাগাল পাওয়া যায় না, ছাতার চেহারা বিচার করে ব্যবহার করার শৌখিনতা তাদের সাজে না।

তখন অর্ধেক পথ প্রায় এসে পড়েছে। আর ফেরার কথা ভেবে লাভ নেই।

হাতের হ্যাণ্ডব্যাগটাই মাথার ওপর তুলে ধরে যতটুকু পারে রোদটা আড়াল করবার চেষ্টা করেছে এতক্ষণ। কিন্তু তাতে কতটুকু ছায়া আর হয়! আকাশ যেন বিরাট একটা জ্বলন্ত ইস্পাতের পাত, তা থেকে অদৃশ্য তরল আগুন ঝরে পড়ছে। মাথা থেকে শুরু করে সর্বাঙ্গে একটা জ্বালা।

এ-দেশের এই রোদই যদি এত দুঃসহ তাহলে মরুভূমিতে লোক কি করে ভেবে শুভা শক্ত হবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে লাভ কি! রোদটা তার একটু বেশীই লাগে। একেবারে সহ্য হয় না। তাছাড়া আজকের রোদ সত্যিই একটা যেন অস্বাভাবিক কিছু। কাল খবরের কাগজে হয়ত কারণটা পড়বে। পশ্চিমের একটা উষ্ণ বায়ুস্রোত মরুভূমির উত্তাপ নিয়ে এ-অঞ্চলে হানা দিয়েছে গোছের কিছু খবর। সেই বায়ুস্রোত একটু থাকলেও ত হত। তার বদলে সমস্ত আকাশ পৃথিবী নিস্পন্দ নিথর, যেন উত্তাপের চাপেই জমাট।

কষ্টটা এই জন্যেই এত বেশী। নইলে রবিবারের দিন ম্যাটিনি শো-তে সে ত আগেও অনেকবার গেছে এই গ্রীষ্মের মধ্যেই। এই নতুন বাসায় উঠে আসবার পরও এর আগে দু-বার।

বিজয়ের সঙ্গে অফিসেই পরিচয় হবার পর এইটুকু ঘনিষ্ঠতাতেই তারা পৌঁছেছে। অফিসে সামান্য দু-চারটে কথা, অন্য সকলের কৌতূহল বা কৌতুক জাগাবার কোন সুযোগ না দিয়ে, কখনো একটু চোখোচোখি আর ফাইল চালাচালির মধ্যে, কখনো একটা চিরকুটে বিজয়ের সংক্ষিপ্ত একটু চিঠি—সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকব।

কিছুদিন থেকে সে-চিঠিও থাকে না। শুধু দুটো টিকিট থাকে ফাইলের ভেতরে লুকনো। শুভাই টিকিট নিয়ে যথাস্থানে যায়।

সাধারণত চৌরঙ্গী অঞ্চলের ইংরেজি ছবির-ই হলে। তারপর পাশাপাশি বসা। অন্ধকারে একটু হাত ধরা। ছবিতে গভীর প্রেমের দৃশ্য কিছু থাকলে সে-হাত ধরায় একটু চাপ, কখনো অন্ধকারেই ছবি না দেখে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চাওয়া। তারপর বেরিয়ে এসে কোন একটা রেস্তোরাঁয় একটু চা বা কফি খেতে-খেতে একটা-দুটো কথা। দুজনের কেউই তারা বেশি কথা বলে না। একজন কেউ মুখর হলে ভাল হত। তবু ওরই মধ্যে শুভাই একটু-আধটু যা আলাপ চালায়। গাঢ় গভীর কোন কথা নয়, কোন আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের কথাও না। সে-সব কথা বলে কোন লাভ নেই তারা জানে।

দুজনেই নিজের নিজের সংসারের দায়িত্বে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে অদূর ভবিষ্যতে তা থেকে মুক্তি পাবার কোন আশা নেই যদি না নিজেরাই জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে পারে। কিন্তু সে-সাহস বা স্বার্থপরতা তাদের কারুরই নেই।

আছে শুধু এই সান্নিধ্যটুকুর বিলাস। বিলাস যেমন তেমনি যন্ত্রণাও। তাই গভীর কথার বদলে কোন সময়ে শুভার মুখ দিয়ে হয়ত বেরয়, ফি হপ্তা এমন করে ছবি দেখতে আর ভাল লাগে না।

বিজয় সেই শান্ত গাঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলে, তাহলে! তাহলে আর কি করতে চাও বল?

কিছু করতেই বা হবে কেন?—শুভা চিৎকার করে বলতে পারলে হয়ত দুজনেই একটু স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতায় পৌঁছতে পারত। তার বদলে শুভাকে একটু ম্লান হেসে বলতে হয়, না আর কিছু করবার নেই।

কিন্তু আর কিছু করবার সময় এবার এসেছে। আর কিছু মানে এই করুণ প্রহসন একেবারে শেষ করে দেওয়ার সময়।

আগের রবিবারই শুভা তার আভাস একটু দিয়েছে। ইচ্ছে ছিল স্পষ্ট করে বলার। কিন্তু আভাসটুকু দেওয়ার পরই কথাগুলো তার গলায় আটকে গেছে।

রেস্তোরাঁয় কফির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে শুধু বলেছিল, সুপার কাল বলছিলেন—

বিজয় বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। প্রথমটা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছে, কে বলছিলেন?

—সুপার, আমাদের মিঃ ঘোষ আগের রবিবার বোধহয় আমাদের দেখেছিলেন। কাল বলছিলেন—আপনি ত খুব সিনেমা দেখেন! এ-রবিবারে কোথায় যাচ্ছেন?

বিজয় কিছুই না বলে পরের কথাটার জন্যে অপেক্ষা করেছিল।

শুভা বলেছিল আবার, মিঃ ঘোষের গলার স্বর কেমন বিরক্ত মনে হল। উনি বোধহয় এসব পছন্দ করেন না।

—তা' ত না করতেই পারেন। ওঁর তাঁবে যারা কাজ করে তারা খুশিমত সিনেমা দেখবে কেন?

শুভা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু বিজয়ের গলা যেমন স্বাভাবিক, তার মুখেও তেমনি কোন ভাবান্তর দেখতে পায় নি।

একটু থেমে বিজয় আবার বলেছিল, ঘোষ আমাকেও সিনেমার কথা বলেছেন।

—তোমাকেও! শুভা সত্যিই বিস্মিত হয়েছিল।

—হ্যাঁ, বললেন,—আপনার ত একটা লিফ্‌টের সময় এসেছে। মাইনে বাড়লে সিনেমা দেখা, হোটেলে যাওয়ার আরো সুবিধে হবে কেমন!

—এই কথা বললেন! শুভা স্তম্ভিত।—তুমি! তুমি কি বললে?

—কিছু না! বিজয় একটু হেসেছিল।—এসব কথার কি উত্তর দেওয়া যায়!

শুভা এইবার যা বলবার বলতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে নি কিছুতেই। কথাগুলো যেন গুছিয়েই নিতে পারে নি মনের মধ্যে। তা সত্ত্বেও বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে গলাটা যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আজ কিন্তু সে তৈরি হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে তৈরি করেই নিয়েছে এই কদিন ধরে। যত বড় রূঢ় আঘাতই হক আজ নিজের ও বিজয়ের খাতিরেই নির্মম তাকে হতে হবে।

মনস্থির করে ফেলেছে সে এই হপ্তার গোড়া থেকেই। গত রবিবারের পর সোমবার অফিসে গিয়ে পরের দিন একটু বেলা করে আসবার অনুমতি চেয়েছিল। ছোট বোন রুনুকে নতুন স্কুলে ভর্তি করাতে হবে তাই। মার অসুখের সময় পাওনা-ছুটি সে প্রায় সব খরচ করে ফেলেছে। কামাই না করে একটু দেরি করে আসবার ওই সুবিধাটুকু তাই চায়। এর আগে মিঃ ঘোষ উদার হয়েই এ-ধরনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন তাই এই সাহস।

ঘোষ কিন্তু আরজিটা শুনেও যেন শোনেন নি। ফাইলটা একটু যেন বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখে সই করে শুভার হাতে দিয়েছেন।

শুভাকে বাধ্য হয়ে আর একবার আবেদনটা জানাতে হয়েছে।

ঘোষ বিরক্তি দেখান নি, বরং বেশ একটু সহাস্য প্রসন্ন মুখেই বলেছেন, বাড়ির এসব কাজগুলো ছুটির দিন করবার বুঝি সময় পান না?

স্কুলে ভর্তি করান যে ছুটির দিনে সম্ভব নয়, শুভা সে-কথা সসঙ্কোচে বোঝাবার চেষ্টা করার আগেই ঘোষ আবার হাসতে হাসতেই বলেছেন, ওঃ ছুটির দিনগুলোয় ত আপনার আবার অন্য সব কাজ! বেশ দেরি করেই আসবেন কাল। ভর্তি করা ত বছরে একবারের বেশি নয়। না, কি আরো ভাইবোন আছে ক্রমশ প্রকাশ্য?

শুভার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। অস্ফুট গলায়- 'না আর নেই' বলে চলে আসবার জন্যে পা বাড়াতেই ঘোষ আবার ডেকে বলেছেন, হ্যাঁ শুনুন।

শুভাকে ফিরে দাঁড়াতে হয়েছে সন্ত্রস্ত হয়ে।

ঘোষ বলেছেন, আমাদের গার্ডেনরীচের অফিস থেকে ফাইলিং -এর জন্যে ভাল একজন কাউকে চেয়ে পাঠিয়েছে। ভাবছি আপনার নামটা দিয়ে পাঠাব কি না! ওখানে কাজ খুব হালকা। বলতে গেলে সারাদিনই ছুটি। কি বলেন, আপনার নামটাই দিই?

রাগে ক্ষোভে তখন শুভার চোখে জল এসেছে। 'না।' বলে কোনরকমে নিজেকে সামলে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে ঘোষের কামরা থেকে। আর সেই মুহূর্তেই সঙ্কল্প করেছে বিজয়ের সঙ্গে এই ক্ষীণ হৃদয়ের সম্পর্কটুকুও ঘুচিয়ে দেবার। বিজয়কে স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেবে যে নিষ্ফল একটা স্বপ্নবিলাসের জন্যে জীবিকাকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি ও সাহস তার নেই। হপ্তার আর ছটা দিনের মত জীবনের রবিবারগুলোও ধূসর বিস্বাদ হয়ে যাওয়া তার সইবে, কিন্তু জেনে শুনে নিজের চাকরির ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারবে না।

বিজয়ের সঙ্গে সব বোঝাপড়া শেষ করবার জন্যেই আজ আসা। বিজয় নিশ্চয়ই অনেক আগে থাকতে পেট্রল পাম্পের ধারে উৎসুক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দেখা হতেই কিছু বলবে না। আজ শেষ দিন। এই দিনটির প্রতিটি মুহূর্ত যেন স্মৃতিতে সঞ্চিত হয়ে থাকে। দুজনে পাশাপাশি সীটে গিয়ে বসবে। ছবিও দেখবে পরস্পরের হাত ধরে। ছবি শেষ হবার পর বিজয় কোন রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে চাইবে নিশ্চয়। শুভা তখনই আপত্তি জানাবে। বলবে, না, আজ আর ভিড়ের ভেতর কোথাও নয়, তার চেয়ে মাঠে কোথাও গিয়ে বসি চল। বিজয় হয়ত অবাক হবে একটু, কিন্তু বাধা দেবে না। তারপর একটু নির্জনতা কি কোথাও পাওয়া যাবে না, মুক্ত আকাশের তলায়, যেখানে ক্রমশ ঘনায়মান অন্ধকারে নিষ্ঠুরতম

আঘাত দিয়ে ও নিয়ে পরস্পরের কাছে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসা যায়?

আর বেশি দূর নয়। পেট্রল পাম্পের লাল তেল-মাপা যন্ত্র দুটো দেখা যাচ্ছে। ও-দুটোও যেন রক্তিম শিখার মত জ্বলছে। হ্যাণ্ড-ব্যাগটা মাথার ওপর ধরে আর সুবিধে হয় নি। শুভাকে আঁচলটাও মাথায় তুলে ঢাকা দিতে হয়েছে। তাতেও রোদ আর কতটুকু আটকায়। মনে হচ্ছে দেহের সমস্ত পোশাক বুঝি এখুনি হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠবে। মুখটা বোধহয় পুড়েই গেছে ইতিমধ্যে।

পেট্রল পাম্পে পৌঁছে কিন্তু শুভা নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বিজয় সেখানে নেই। হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে তার কাঁটাগুলোকেই মিথ্যেবাদী বলে মনে হয়। তিনটে বাজতে দশ মিনিট যেন হতে পারে না। ঘড়ির কাঁটার চেয়ে বিজয়ের আসা নির্ভুল। কোনদিন তার নড়চড় হয় নি এ-পর্যন্ত। ঘড়িটাই কি তাহলে ভুল চলছে!

পেট্রল পাম্পের পাশের একটি বাড়ির বারান্দার যে-ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিজয় অপেক্ষা করে, শুভা সেইখানেই গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তার হাতঘড়িতে তিনটের ঘর পার হয়ে যায় কাঁটাগুলো।

মাথাটা তার ঝিমঝিম করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। একটুখানি এগিয়ে রাস্তাটা ঘুরে গেলেই একটা পান-সিগারেট সোডা-লেমনেডের দোকান। কিন্তু শুভা তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেলেও সেটুকু যেতে সাহস করে না। বিজয়ের এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। এখন এসে দেখা না পেয়ে শুভা আসে নি মনে করে হতাশ হয়ে যদি চলে যায়!

কিন্তু বিজয় আসে না। বারান্দার ছায়াটা সরে যাওয়ার সঙ্গে শুভাকেও একটু সরে দাঁড়াতে হয়। আকাশ এখনো সমানে আগুন ছিটচ্ছে।

আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে? পেট্রল পাম্পের লোকেরা লক্ষ্য করছে নিশ্চয়। কোন মোটর ইতিমধ্যে সেখানে তেল নিতে আসে নি, সুতরাং একলা একটি যুবতী মেয়ের এই দুরন্ত রোদের মধ্যে ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা তাদের কৌতূহল জাগাতে বাধ্য। কিন্তু এই রোদ মাথায় নিয়ে এখন আর বাড়ি ফিরতে পারবে না। একা-একাই সিনেমা হলে যেতে পারে অবশ্য। কিন্তু এসে দাঁড়াবার পরেই প্রথম বাস্‌টা ছেড়ে দিয়েছে। এখন কতক্ষণে আবার বাস আসবে কে জানে। এলেও এত দেরিতে ছবি দেখতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। সময় থাকলেও একলা বসে ছবি দেখতে সে কি পারত আজ?

বিজয়ের হঠাৎ কোন অসুখ-বিসুখ কি দুর্ঘটনা?

তীব্র উদ্বেগের একটা বিদ্যুৎ-শিহর তুলেই দুর্ভাবনাটা মিলিয়ে যায়।

না, বিজয়ের সে-রকম কোন কিছুই হয় নি সে জানে।

এতক্ষণ বাদে একটা গাড়ি তেল নেবার জন্যে পাম্পে এসে দাঁড়াবার পর আর কোন সংশয় তার মনে থাকে না।

গাড়িটা তার চেনা। তেল নিয়ে ও-গাড়ি তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে হয়ত হঠাৎ থামবে। যিনি চালাচ্ছেন তিনিই হয়ত জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলবেন, একি! আপনি এখানে? কোথায় যাবেন? আসুন পৌঁছে দিই।

তিনি হয়ত দরজাটা খুলে ধরবেন।

আর এই রোদে আবার হেঁটে বাড়ি ফেরবার যন্ত্রণাটা কল্পনা করে সে নীরবে বিনা প্রতিবাদে গাড়ির ভেতর গিয়ে বসবে।

গোড়ার পাতা নেই, হয়ত শেষের পাতাটাও। ঠিকানা-দেওয়া খামটারও চিহ্ন নেই কোথাও।

এ-কার্তি আমার পাঁচ বছরের ভাইপো রাজাবাবুর।

রাজাবাবু নতুন অ আ ক খ পড়তে শিখেছেন। ছাপার অক্ষরে বা হাতের লেখায় যা-কিছু আছে সব কিছুর ওপর তাই তাঁর অধিকার জন্মেছে। আলমারি সেলফের বইটই ত সামলে রাখা দায় হয়েছে, চিঠিপত্র এলেও তাঁর হাত থেকে রক্ষা নেই।

চিঠিপত্র যখন যা আসে আমার টেবিলে গুছিয়ে রাখা হয়—রাজাবাবু জানেন। তিনি ইদানীং আমার কাজের সুসার করে দিচ্ছেন খাম খুলে চিঠিপত্র নিজেই আগে পরীক্ষা করে নিয়ে।

কাগজ কটা এইভাবেই চিঠি রাখবার জায়গায় পেয়েছিলাম।

আমার চিঠি ভেবেই পড়তে শুরু করেছিলাম অবসর মত কিন্তু কয়েক লাইন পড়েই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

এ-চিঠি ত আমার নয়! আমার টেবিলে এ-চিঠি এল কোথা থেকে?

খামটার খোঁজ করে পাই নি। চিঠির ভেতরই কার চিঠি সে বিষয়ে কোন হদিস পাওয়া কি না দেখবার জন্যে সমস্ত লেখাটা মন দিয়ে পড়েছিলাম। অন্যায় কৌতূহলও যে ছিল তা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু হদিস তাতেও পাই নি।

হদিস ওই কয়েকটি নাম। তাও পদবী নয়। তা দিয়ে এ-চিঠি কে কাকে লিখেছে কিছু অনুমান করা কি সম্ভব?

খামটায় ঠিকানা ভুল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ভুল ঠিকানা থেকেও কিছু একটা কিনারা বোধ হয় করা যেত।

এখন সে-রাস্তাও বন্ধ।

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেও দিতে পারতাম কিন্তু মনে হ'ল তা উচিত

নয়। অসাধারণ কিছু না হলেও এ-চিঠির মধ্যে জীবনের বিচিত্র করুণ জটিলতার কিছু পরিচয় যেন আছে।

জীবনের অস্পষ্ট ছেঁড়া দলিল হিসেবেও কিছু মূল্য তার পাওনা।

চিঠি গল্প কি উপন্যাস নয়। বিশেষ করে যে-চিঠি জীবনের পরম কোনজনকে হৃদয়ের উত্তাল কোন মুহূর্তে লেখা।

চিঠির মাঝে অনেক কিছুই উহ্য থাকে, অনেক কিছু অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট। ঘটনার ধারাবাহিকতা তার মধ্যে থাকবার নয়, ব্যাখ্যাও মেলে না অনেক কিছুর। অনেক কৌতূহল সেখানে অতৃপ্ত থেকে যায়। বিবরণের অভাব পূরণ করে নিতে হয় অনুমান দিয়ে।

এ-চিঠি যে লিখেছে সেই রমা, যাকে লিখেছে সেই মহিম, যে-মেয়েটি এ-চিঠির মধ্যে রহস্যের কুয়াশাতেই প্রায় ঢাকা থেকে গেছে তাদের কাউকেই পুরোপুরি চেনা যায় না। কাহিনীর ইতিহাস ভূগোল সবই অনেকখানি কল্পনা করে নিতে হয়।

যেমন রমাদের বাড়িটাই ধরা যাক। কেমন ছিল সে-বাড়িটা। ছোট বাড়ি অবশ্যই নয়। কারণ রমা যে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত তা চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়। কিন্তু বাড়িটিতে দুটি আলাদা ভাড়াটে পরিবারও থাকে। মহিমদের অবস্থা তার মধ্যে হয়ত স্বচ্ছল। কিন্তু অনিতাদের দারিদ্র্য বেশ বোঝা যায়।

ভাবা যেতে পারে রমারা থাকে দোতলায় আর নিচের তলা দু-ভাগে দু-পরিবারকে ভাড়া দেওয়া আছে। কিংবা ভাড়াটে আর মালিকের বাড়ি আলাদা হতে পারে, আলাদা কিন্তু পরস্পরের সংলগ্ন। কারণ এ-বাড়ি ও-বাড়ির মধ্যে যাতায়াতের পরিচয় পাই।

রমা নিজেই এই দু-বাড়িতে যায় আসে। মহিমের সঙ্গে তার ছেলেবেলা থেকে জানাশোনা। অনিতারা হয়ত তখনও এ-বাড়িতে আসে নি।

কিরকম মেয়ে রমা? কি তার চেহারা? বড়লোক

বাপমায়ের একমাত্র মেয়ে। দম্ভ থাকে সে-জন্যে মনে মনে। হয়ত রূপেরও গর্ব। মহিম সম্বন্ধে উদাসীন হতে পারে না, আবার তার কাছে ধরা দিয়ে ছোট হতেও বাধে। অনুরাগটা তাই কি প্রকাশ পায় অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যরূপে! তার চেহারা কত-রকমই ভাবা যায়। সে কুৎসিত নয় নিশ্চয়ই। কোথাও উল্লেখ না থাকলেও রূপের গর্ব যেন চিঠির মধ্যে কোথায় উহ্য আছে। সে-রূপ হয়ত মহার্ঘ পোশাকে অলঙ্কারে একটু মাত্রাহীন ভাবে উগ্র। ঠিক সলজ্জ নম্র কোমল একটি মেয়ে হিসেবে রমাকে ভাবতে পারি না।

রমার বিয়ে হয়েছিল নিজেদের চেয়েও বড় ঘরে বলে মনে হয়। বেশি দিন স্বামীসঙ্গ পায় নি। কয়েক বছর বাদেই স্বামীকে হারিয়েছে। ঐশ্বর্যের অহঙ্কারই রমার জীবনের অভিশাপ। হয়ত পয়সা প্রতিপত্তি আভিজাত্যের খাতিরে নিজের চেয়ে অনেক বেশি বয়সের পাত্রকে বিয়ে করতে রমা রাজী হয়েছিল। পাত্র বিপত্নীকও ভাবা যায়। মহিম যে তার ঐশ্বর্যের শিখর থেকে প্রায় দৃষ্টি-সীমার বাইরে রমা বোধহয় তাই বোঝাতে চেয়েছিল। হৃদয়ের কি বিচিত্র আত্মবিরোধ!

মহিম আর রমার ছেলেবেলা থেকে যৌবন পর্যন্ত অনেক দৃশ্য মনে মনে আঁকতে ইচ্ছা হয়। শৈশবের অকৃত্রিম সারল্য কবে কেমন করে ঘুচে গেল। যৌবনোদ্ধত একটি মেয়ে কি দুর্বোধ প্রেরণায় নিজের মুখ মুখোশে দিল ঢেকে? সে-মুখোশও ত আত্মপীড়ন ছাড়া কিছু নয়।

মহিমও কি তখন থেকেই নিজের চারিধারে বেড়া তুলেছিল দুর্জ্ঞেয় অভিমান আর আত্মনিমগ্নতার! রমাদের ঐশ্বর্যের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াবার মত জীবনে উন্নতি করার সঙ্কল্প কি তার তখন থেকেই শুরু? সেই সঙ্কল্পের পেছনে তখনই কি ছিল তীব্র এক ধিক্কার, আকুলতার সঙ্গে বিরূপতা যা মিশিয়ে দিয়েছিল।

না, তার ইতিহাস অনিতার সঙ্গে জড়ানো?

কেমন মেয়ে এই অনিতা?

ভাবতে পারা যায় করুণ শান্ত অসহায় একটি মেয়ে, ছায়ার মত রমাকে যে অনুসরণ করে। রাজদ্বারে দণ্ডিত দরিদ্র বাপের মেয়ে হিসাবে যে সকলের করুণার ভিখারী। রমার শুধু নয় মহিমেরও।

কিংবা চাপা ও চতুর, নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে দ্বিধাহীন, অভিনয়নিপুণ একটি মেয়ে হিসাবেও তাকে কল্পনা করা যায়। তাদের অভাবের সংসার, তার ওপর লেগে আছে কলঙ্কের ছাপ। তাকে অনেক কিছু নীরবে সহ্য করতে হয়, রমার সদম্ভ অনুগ্রহের দান নিতে হয় দীন হীনভাবে। মনে তার কি জ্বালা বা ক্ষোভ যে ধোঁয়ায় তা কেউ জানে না। সে নিজেও জানে না কি নিষ্ঠুর ঘটনাবর্তের সে বলি হতে চলেছে।

এ যেন কিছু-আঁকা কিছু-মোছা একটা ছবি কল্পনার তুলিতে যা সম্পূর্ণ করবার যথেষ্ট অবকাশ বর্তমান। কৌতূহলী পাঠককে শুধু সে-সুযোগ দেবার জন্যে নয়, এ-চিঠি যার উদ্দেশে লেখা সেই মহিমের চোখে পড়বার আশাতেও এ-লেখা প্রকাশের ব্যবস্থা করলাম।

•

...তোমায় এবারে কতদিন আগে প্রথম ফোন করেছিলাম তোমার বোধ হয় মনে নেই—কিন্তু আমার আছে। ঠিক দু-বছর আগে এই তারিখে। তোমার অফিসেই তোমায় ডেকেছিলাম। দিনের বেলায় তোমার কাজের ভিড়ের মাঝখানে। সেদিন তুমি প্রথমটা চিনতে পার নি। তারপর অবশ্য নিষ্ঠুর হয়ে না-চেনার ভান কর নি। তোমায় কাজের ছুতোয় একবার আমাদের বাড়ি আসতে বলেছিলাম। বলেছিলাম একটা সম্পত্তি নিয়ে মামলার ব্যাপারে তোমার পরামর্শ চাই। তুমি আপত্তি কর নি। কথা দিয়ে সময়মতই দেখা করতে এসেছিলে।

মামলার ওকালতির লোভে যে আস নি তা বুঝেছিলাম। আমার চেয়ে অনেক বড় বড় মক্কেল তোমার দরজায় গিয়ে আজকাল ধন্না দেয়; আমি জানি। মামলার বিবরণ শুনে মনে মনে নিশ্চয় হেসেছিলে, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ কর নি। শুধু বলেছিলে যে তুমি ফৌজদারী কোর্টের কাজ বেশি কর, তাই এ-সব দেওয়ানী মামলার কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করানই ভাল। তোমার বন্ধু একজন উকিলের নামও বলে দিয়েছিলে। ফোনে মামলার কথা যখন জানাই তখনই অবশ্য এ-পরামর্শ দিতে পারতে। কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে চেয়েছিলে একবার, আমিও এখনকার মহিমকে। কিন্তু দুজনের দেখতে চাওয়ার কারণ আলাদা। তুমি দেখতে চেয়েছিলে দশ বছর আগের সেই দাম্ভিক স্বার্থপর মেয়েটা এখন কি অবস্থায় আছে। নিজের ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি দেখিয়ে আমায় ছোট করতে আস নি। সে-রকম ছোট মন তোমার নয়। তুমি নিজের গাড়িতে না এসে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করেই এসেছিলে। আমায় ভাল করেই লক্ষ্য করেছিলে যতক্ষণ ছিলে, কিন্তু কোন অস্বস্তিকর প্রশ্ন কর নি। আমার থান-পরা চেহারা দেখেও নয়। জিজ্ঞাসা করবার প্রবৃত্তি হয় নি হয়ত, কিংবা হয়ত আগেই জানতে। আমি অন্তত তাই মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আমাকে তুমি মন থেকে মুছে ফেলতে পার নি, গোপনে গোপনে আমার সব খবরই রেখেছ। সে-ভুল ধারণা আমার সেই দিনই ভেঙেছিল অবশ্য। এই ভুল ধারণাটুকুই আমার মনের কথা ধরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আমি যে কেন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম তা আর সুতরাং ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। তুমিও সেদিন কি তা বুঝতে পার নি? মনে হয়, পেরেছিলে। যদিও স্পষ্ট কোন কথাই হয় নি আমাদের মধ্যে। হওয়া সম্ভবও ছিল না। আমি তোমাকে আমার বাড়িটার ওপর

নিচে সব দেখিয়েছিলাম। দেখাবার কোন মানে হয় না। হেলাফেলা করবার মত বাড়ি বা তার সাজসজ্জা আসবাবপত্র নয়, কিন্তু এর চেয়ে অনেক ধনকুবেরের রাজপ্রাসাদ তুমি নিশ্চয় দেখেছ। বাড়ি ঘর দেখা শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে তুমি শুধু একটা কথা বলেছিলে যা আমি কৃপণের ধনের মত মনের পুঁজি করে রেখেছি। তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে—এই বাড়িতে তুমি একলা থাক? আমি হেসে বলেছিলাম—একলা কেন? লোকজন দাসদাসী কি কিছু কম দেখছ? তুমি আমার মুখের দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে চেয়ে থেকে কি বলতে গিয়ে যেন বল নি।

নিচের বসবার ঘরে অনেকক্ষণ তারপর তোমাকে জলখাবার খাওয়ানোর ছুতোয় ধরে রেখেছিলাম। ম্যানেজারবাবু তখন সেখানে ছিলেন। তাঁকে তোমার কাছে উকিল ঠিক করবার জন্যে যেতে বলেছিলাম। ম্যানেজারবাবু অবাক হয়েছিলেন নিশ্চয়। আমাদের এস্টেটের মামলা মোকদ্দমা দেখবার ভাল লোকই আছে যথেষ্ট। একটা সামান্য মামলার জন্যে নতুন উকিলের ব্যবস্থা করতে তোমার মত ডাকসাইটে লোককে বাড়িতে আনিয়ে সাহায্য চাইব—এটা তাঁর কাছে অভাবনীয়। হয়ত শুধু বড়মানুষী খেয়াল বলেই ধরে-ছিলেন কিংবা আর কিছু অনুমান করেছিলেন।

খাইয়ে দাইয়ে বাড়ির গাড়িতে তোমায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। গাড়িতে ওঠবার আগে শুধু না জিজ্ঞাসা করে পারি নি—বিয়ে-থা তা হলে আর করলে না!

দেয় কে?—বলে হেসে গাড়িতে উঠেছিলে।

ম্যানেজারবাবু তারপর তোমার কাছে আর যান নি। আমিই বারণ করেছিলাম।

তার বদলে আমিই তোমায় ফোন করেছিলাম আবার। দিনের বেলা নয় রাত্রে। তবে বেশি রাত্রে নয়। সন্ধ্যের পর তখন তুমি নিজের লাইব্রেরিতে বসে নথিপত্র ঘাঁটছ। সে-রাত্রে আমার

ফোন পেয়ে তুমি খুশি হয়েছ মনে হয়েছিল। হয়ত সেদিন মনটা তোমার ভাল ছিল। হয়ত শক্ত কোন কেস্ সেদিন জিতেছিলে কিংবা তোমাদের সেই পুরনো বাড়িওয়ালার অহঙ্কারী মেয়েটার নিজে থেকে সেধে তোমার খোঁজ নেওয়ায় তোমারও অহমিকা একটু তৃপ্ত হয়েছিল। সেদিন তুমি কি বলেছিলে মনে আছে? বলেছিলে সুযোগসঙ্গতি এবং কাজ করবার বয়স ও সামর্থ্য যখন আছে তখন কোন বড় কাজের ভার আমার নেওয়া উচিত।

একটু বিদ্রূপ করেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কি বড় কাজ? ধর্মকর্ম? মঠ-মন্দির ধর্মশালা স্থাপনা করা না স্কুল-হাসপাতাল বসানো?

বলেছিলে, স্কুল-হাসপাতালই বা নয় কেন? ওরকম আরো অনেক কাজই আছে যা নিয়ে মেতে থাকা যায়। জীবনে তন্ময় হবার মত একটা কিছু সকলেরই দরকার।

তোমার যেমন পয়সা আর ওকালতি?—খোঁচা দিয়েছিলাম।

তুমি একটু চুপ করে থেকে যেন অন্য রকম গলায় বলেছিলে, হ্যাঁ তাই।

তোমার গলার স্বরটা গাঢ় হবার কারণ বুঝেও যেন বুঝতে চাই নি। হেসে বলেছিলাম—আমায় ত ধর্মকর্ম কি সমাজসেবা করতে বলছ। তুমিও ত ঘর-সংসার করলে পার। কতই বা তোমার বয়স। আমার চেয়ে বছর পাঁচের ত বড়। এ-বয়সে আজকাল পুরুষরা আকছার বিয়ে করে।

ইচ্ছে থাকলে করে।—বলে তুমি যেন প্রসঙ্গটা পালটাতে চেয়েছিলে।

আমি তবু জোর করে ধরে থেকে বলেছিলাম—তোমার ইচ্ছে করে না? কেন? সেই চোরেদের বাড়ির চোর মেয়েটার জন্যে?

কথাটা বলে ফেলেই শিউরে উঠেছিলাম। জিবটা যেন আমার

নিজের কথার জ্বালাতেই ঝলসে গিয়েছিল। বুঝেছিলাম, এতকাল বাদে যেটুকু জোড় লেগেছিল তাও আবার কেটে গেল।

তুমি ইস্পাতের মত কঠিন আর বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলে—সেই চোর মেয়েটা ত চুরির চরম প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে। আর তার কথা কেন? তা ছাড়া অনিতার এ-অপবাদের বিরুদ্ধে তুমিই ত সব চেয়ে বেশি প্রতিবাদ করেছিলে বলে মনে পড়ছে।

ভুলটা সামলাবার বৃথা চেষ্টায় বলেছিলাম গলায় হালকা সুর এনে—তুমি ত আচ্ছা মানুষ! একটু ঠাট্টাও বোঝ না।

ঠাট্টা!—তুমি হেসেছিলে একটু তিক্ত ভাবে। বলেছিলে—তোমার ঠাট্টা বড় বেশি সূক্ষ্ম তা হলে বলব, প্রায় অদৃশ্য ছুঁচের মত। আর জান ত আমি চিরকালই বেরসিক। মোটা হাসিঠাট্টাও কোন কালে ভাল বুঝতাম না। আচ্ছা আজ চলি।

তুমি ফোনটা নামিয়ে রেখেছিলে আর আমি একসঙ্গে তীব্র অনুশোচনা আর নিরুপায় আক্রোশে জ্বলে পুড়ে মরেছিলাম।

আর কোনদিন তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না।

আবার একদিন সন্ধ্যেবেলায় তোমায় ফোনে ডাকলাম। তুমি লাইব্রেরি ঘরে ছিলে না। তোমার জুনিয়ারই কেউ হবেন বোধ হয় জানালেন যে তুমি অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে আছ।

শুনে অস্থির হয়ে উঠলাম। অত্যন্ত জরুরী দরকার বলে মিনতি করায় ফোনটা তোমার ঘরে দিতে ভদ্রলোক রাজী হলেন।

ভেবেছিলাম আমার গলা শুনেই ফোন নামিয়ে রাখবে। কিন্তু তা রাখ নি। এখন মনে হচ্ছে যত বড় অপমানই হক তাই করলে বুঝি আমার ভাল হত। দুঃসহ আনন্দ আর তীব্রতম যন্ত্রণা যার মধ্যে মেশানো সে-সত্য তা হলে আর জানতে পারতাম না।

প্রথমেই তোমার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তুমি

তাচ্ছিল্যভরে জানিয়ে ছিলে, সামান্য একটু সর্দি-জ্বর মাত্র। ডাক্তাররা নেহাত ছাড়ে না তাই তাদের খুশি রাখতে একটু বিছানায় গড়াচ্ছ।

তোমার কথার সুর শুনে আশ্বস্ত যেমন তেমনি অবাক হয়েছিলাম। সেদিনকার কথা যেন ভুলেই গেছ মনে হয়েছিল। কোন তিক্ত রেশ তার আর নেই।

একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিলাম—তোমার সর্দি হলে ত আবার মাথায় বসে। জ্বর ছাড়লেও মাথার যন্ত্রণায় বিছানা ছেড়ে উঠতে পার না।

তুমি হেসে বলেছিলে—মাথা এখন আইনের কচকচিতে বোঝাই। সর্দি বসবার জায়গা নেই। কিন্তু তোমার ত মনে আছে দেখছি।

তখনি কোন উত্তর দিতে পারি নি গলাটা ধরে এসেছিল বলে। আমার কি মনে আছে না আছে তা তুমি কি করে জানবে! একটু নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছি—যদি রাগ না কর একটা কথা বলি।

রাগ করি বা না করি, বলবার মত কথা হলে নিশ্চয় বলবে।—তুমি কৌতুকের সুরেই বলেছিলে।

দ্বিধাভরে তখন বলেছি—সেদিন তোমাকে না বুঝে বড় বেশি আঘাত দিয়েছিলাম। কিন্তু যা বলতে চেয়েছিলাম সেটা বোধ হয় অন্যায় নয়। অনিতাকে তুমি ভুলতে পার নি জানি, কিন্তু তুমি ত স্বপ্ন নিয়ে দিন কাটাবার মানুষ নও⋯

থাম।—হঠাৎ তীব্রস্বরে তুমি বাধা দিয়ে বলেছিলে—অনিতা! অনিতা! বুকের ভেতর তোমার লুকনো আত্মগ্লানির ঘা। সেখানে বীজাণুর মত তুমি ওই স্মৃতির বিষ পুষে রেখেছ। তোমার কাছে ও-নাম গ্লানির জপমালা হতে পারে কিন্তু আমার কাছে নয়। ও-নাম ও-স্মৃতি আমি ভুলতে চাই। মন থেকে মুছে ফেলে দিতে চাই

একেবারে। আজ থেকে তুমি আর আমি এক পৃথিবীতে নেই বলে মনে করো। কোন সংস্রব রাখবার আর চেষ্টা করো না। দুজনের জগৎ চিরকালের মত আলাদা হয়ে যাবে বলেই শেষ একটা কথা তোমাকে এতদিন বাদে জানাচ্ছি। আমার জীবন অনিতার জন্যে শূন্য করে রাখি নি। অনিতারা আমাদেরই মত তোমাদের আর এক ভাড়াটে। ছেলেবেলা থেকে তোমার মত তাকেও চিনি জানি। স্নেহ করবার মত, আমাদের চেয়েও দরিদ্র পরিবারের মায়া করবার মত একটি মেয়ের বেশি কছু সে আমার কাছে ছিল না। তার ওপর স্নেহ মায়া ভালবাসা তোমারই ছিল জানতাম আমার চেয়ে অনেক বেশি। তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে আমাকে তুমি কতবার ছোট করবার চেষ্টা করেছ আমি ভুলি নি। তার প্রতি তোমার ব্যবহারে একদিন যেমন ঈর্ষায়।একটু জ্বালার সঙ্গে কৌতুক অনুভব করেছি, আর একদিন তেমনি স্তম্ভিত হয়েছি। সে-বিহ্বল বিমূঢ়তা তার পর তীব্র ঘৃণায় সমস্ত মন জর্জর করে দিয়েছে। হ্যাঁ রমা, যার জন্যে জীবন আমার শূন্য তার প্রতি ভালবাসা আমার যেমন দুর্বার, ঘৃণাও তেমনি সীমাহীন।

তুমি ফোনটা সশব্দে নামিয়ে দিয়েছিলে। সেই কর্কশ ঝঙ্কনার সঙ্গে সত্যিই আমাদের জগৎ ভেঙে চুরে দু-টুকরো হয়ে গেছল।

তারপর আর কোনদিন তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি নি।

আজ কেন করছি?

প্রথমতঃ, এ-চিঠি যখন পাবে তখন সত্যিই এ-পৃথিবীতে আর থাকব না বলে। না, স্বেচ্ছামৃত্যু নয়—দস্তুরমত চিকিৎসাশাস্ত্র-সম্মত আইনসঙ্গত রোগ।

আমার ঠিকানা আমি দিই নি, তবু ডাকঘরের ছাপ খুব অস্পষ্ট না হলে জায়গাটার নাম হয়ত জানতে পারবে। জানা-না-জানায় অবশ্য কিছু আসে যায় না। এখানে আমি অনেক দিন ধরেই

আছি। বিষয়-সম্পত্তির কি করেছি তুমি হয়ত সত্যিই আর জানতে চাও না। কিন্তু তুমিই একদিন কোন বড় কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে বলেছিলে বলে, জানাচ্ছি। না, বিষয়-সম্পত্তির কোন ব্যবস্থাই করি নি, ছোট বড় কোন কাজেই দান করি নি কিছু। একবার ইচ্ছে হয়েছিল তোমার নামেই সব লিখে দিয়ে যাই, কিন্তু সেটা পাছে প্রতিশোধের মত মনে হয় বলে তা শেষ পর্যন্ত করি নি। বিষয়-আশয় যেমন ছিল তেমনি আছে। আমার পিতৃকুলে কেউ আর নেই তুমি জান, শ্বশুরকুলেও তাই। তবু অতি দূর সম্পর্কের কেউ-না-কেউ আমার মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি নিয়ে নিশ্চয় মারামারি কাটাকাটি করবে। তাই করুক। অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্য উত্তুঙ্গ করে তুলে যা আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে সে-বিষে যাদের লোভ তারাই বা রেহাই পাবে কেন ?

এ-চিঠি লেখার আসল কারণ এবার বলি। জীবনের শেষ মুহূর্তে তোমার কাছে সব স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া। কি করে জানি না, কিছুটা অবশ্য তুমি নিজেই অনুমান করেছিলে। অনিতার নাম যে আমার কাছে গ্লানির জপমালা এ-কথা সেদিন বলাতেই বুঝেছি। কিন্তু সব কথা তুমি জান না তাই একটা বড় ভুল তোমার মনে থেকে গেছে।

হ্যাঁ, আজ তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করছি যে, অনিতার সেই সামান্য বিস্কুটের টিনের সেলাই আর পশম বোনার সরঞ্জামের বাক্সে আমার হাতের বালা-পাওয়া ব্যাপারটা আমারই সাজানো। সযত্নে বেশ ভেবেচিন্তে ব্যাপারটা সাজিয়েছিলাম। কয়েক দিন আগে থাকতেই এক জোড়া বালার একটার হারিয়ে যাওয়ার কথা বাড়িতে জানিয়েছি। কানের দুল মাথার টিকলি এক আধগাছা চুড়ির মত ছোটখাট জিনিস অনেক দিন থেকেই আমার হারায়। আমি অগোছাল অসাবধানী বলে মা-বাবা একটু-আধটু বকাবকি ও ঝি-চাকর বদলানো ছাড়া সে-সব হারানো নিয়ে তেমন ব্যস্ত হন

নি। বালাটা যাবার পর তাঁরা কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তখন তোমারই জন্যে উলের একটা সোয়েটার বুনছিলাম তোমার মনে আছে কিনা জানি না। একটা কাঁটা ইচ্ছে করে ভেঙে ফেলে একদিন সকালে অনিতাদের বাড়িতে আমাদের পুরানো ঝিকে পাঠালাম। বললাম, দশ নম্বর কাঁটাটা অনিতার বাক্স থেকে নিয়ে আয় ত। অনিতা তখন বাড়ি নেই জানতাম। তুমিই তখন মিল্ক সেণ্টারের কাজটা কোন বন্ধুকে ধরে করে তাকে পাইয়ে দিয়েছ। ঝি খানিক বাদে চোখ কপালে তুলে গোটা টিনের বাক্সটাই নিযে হাজির। তাই করবে জানতাম। বিস্কুটের টিনের সেই বাক্সে নানান খুঁটিনাটির মধ্যে আমার সেই বালাটাও রয়েছে। ঝির চেঁচামেচি থামাবার ভান করলাম। থামবার বদলে তা বাড়ল, বাড়িময হুলস্থুল পড়ল। বাইরের লোকের না হোক তোমাদের কারুর জানতে বাকি রইল না। আমি অনিতার পক্ষ নিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, বালাটা হয়ত ভুলেই ওদের ওখানে ফেলে এসে থাকব। তাতে আগুনে ঘি পড়ল শুধু। অনিতা কাজ সেরে আসবার পর সমস্ত শুনে একেবারে যেন পাথর হযে গেল। স্বীকার অস্বীকার কিছুই সে করলে না। তাব মুখ দিয়ে একটি কথাও কেউ বার করতে পারলে না। তার সেই মুখ এখনো আমি ভুলতে পারি নি। সে-মুখ দেখে আমি কেঁদেছিলাম। বিশ্বাস করো, সে-কান্নাটা ভান নয।

ব্যাপারটা ঘরাঘরি অবশ্য চাপা দেওযা হল। অনিতারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল মাস খানেকের মধ্যেই। পাঁচ বছর আগে তার মারা যাওয়ার খবর তুমিও বোধ হয় পেয়েছ।

কেন এ-কাজ করেছিলাম জিজ্ঞাসা কোরো না। বোঝাতে পারব না। শুধু একটা খবর তোমায় দিই যা তোমার কল্পনার বাইরে।

অনিতার সে-বিস্কুটের বাক্সে শুধু আমার বালাটাই নয়, আমার

সত্যিকার হারানো একটা কানের দুল আর দু-গাছা চুড়িও ছিল। আগের দিন রাত্রে সুযোগ করে নিয়ে শুধু বালাটাই আমি কিন্তু তার মধ্যে রেখে এসেছিলাম···

এর পর আরো কিছু রমা দেবী লিখেছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু চিঠির শেষ পাতাটি ওইখানেই ছেঁড়া।

অনেকক্ষণ ধরে স্বরটা কানে আসছিল।

প্রথমে শুধু কণ্ঠটাই একটু চমকে দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, তারপর কথাগুলোও কৌতূহলী করে তুলেছে।

তবু পেছন ফিরে তাকাই নি। শুধু অভদ্রতা হবে মনে করে যে তাকাই নি তা নয়। হয়ত আশাভঙ্গ হবে এই ভয়েও খানিকটা। তা ছাড়া আজকাল ও-ধরনের দু-চারটে ঝকমকে বুলি মুখস্থ রেখে কিছুক্ষণের জন্যে আসর জমাবার কায়দা অনেকেরই জানা। ওপরের ওই তবকটুকু একটু নাড়াচাড়াতেই উঠে যায়।

বৃষ্টিটা ধরবার আশায় চৌরঙ্গী পাড়ার একটা রেস্তোরাঁয় কফি আর কিছু আনুষঙ্গিক নিয়ে বসেছি। হাল ফ্যাশনে সাজানো-গোছানো হলেও রেস্তোরাঁটি নেহাত সঙ্কীর্ণ অপরিসর। এক পাশে সিঁড়ি দিয়ে নকল একটা দোতলা তুলেও জায়গার বিশেষ সুসার হয় নি। টেবিলগুলো প্রায় গায়ে-গায়ে লাগানো। তার ফাঁকে-ফাঁকে গলে চেয়ার নিয়ে বসা একটা কসরত। চেনা-অচেনায় ঠেসাঠেসি না হোক ঘেঁষাঘেঁষিটা একটু অস্বস্তিকর হয়।

সন্ধ্যার পর ভিড়টা প্রতিদিনই একটু বেশী থাকে, আজ বৃষ্টির কল্যাণে আর তিলধারণের জায়গা নেই। বাড়তি চেয়ার দেবার জায়গা থাকলে তা দিয়েও যে চাহিদা মেটানো যেত না, কাঁচের দরজা ঠেলে উর্দিপরা দারোয়ানের সেলাম নিয়ে উৎসুক খরিদ্দারদের ঢোকা আর হতাশভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বেরিয়ে যাওয়া থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন রকমে একটু আগে থাকতে ঢুকে একটা চেয়ার যে পেয়েছি এই ভাগ্যের কথা। ভাগ্যটা অবিমিশ্র নয়। চারজনের বসবার টেবিল। বাকি তিনটি আসনে অপরিচিত একটি অবাঙালী পরিবার আমার অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে নিজেদের অপ্রসন্নতা ক্ষণে

ক্ষণে ভাবে ভঙ্গিতে এমন কি ভাষাতেও প্রকাশ করছেন। তাঁদের সৌজন্যের অভাব অত উগ্র না হলে এক প্রস্থ কফি খেয়ে হয়ত সত্যিই রেস্তোরাঁর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বারান্দার নিচে ফুটপাথে গিয়ে বৃষ্টি ধরার জন্যে অপেক্ষা করতাম।

রেস্তোরাঁর চেয়ে বাইরের বৃষ্টির ছাটলাগা জনাকীর্ণ ফুটপাথও শ্রেয় মনে করবার অন্য কারণও ছিল। এই নতুন ধরনের রেস্তোরাঁগুলির বেশীর ভাগই ইদানীং সঙ্গীত পরিবেশন একটা আকর্ষণ করে তুলেছে। অপরিসর রেস্তোরাঁর একটি কোণে সামান্য উঁচু একটি বেদী গোছের থাকে। জায়গায় কুলোলে তাতে একটি পিয়ানো স্থান পায়। নইলে বিলাতী কয়েকটি মুখে বা হাতে বাজাবার যন্ত্র শুধু। তাদেরই সহযোগিতায় সাধারণতঃ অত্যন্ত কদর্য বেশবাসে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে মাইকের সাহায্যে সস্তা বিলাতী গানের অক্ষম নকলে ভোজনশালার সিগারেটের ধোঁয়া ও ভোজ্যদ্রব্যের গন্ধে ভারী বাতাস দুঃসহ করে তোলে। যে-গায়িকার যত কর্কশ পুরুষালি গলা, তার নাকি তত খাতির। আপাততঃ এখানেও সেই অবাঞ্ছিত উপদ্রব শুরু হবার উপক্রম দেখেই মনটা পালাই-পালাই করছিল। শুধু আমার টেবিলের অচেনা সঙ্গীদের স্বার্থপর অভদ্রতাতেই জেদ করে জ্বালা ধরাবার জন্যে আরেক প্রস্থ কফির অর্ডার দিয়ে গ্যাঁট হয়ে নিজের আসনে বসে রইলাম।

তা না থাকলে দ্বিতীয়বার সুমিতার সঙ্গে দেখা হত না।

পেছনে যে-কণ্ঠস্বর এতক্ষণ কৌতূহলী করে তুলেছিল তা যে সুমিতারই তা অবশ্য তাকে চোখে না দেখা পর্যন্ত ভাবতে পারি নি।

ভাববই বা কি করে।

আমি এ-কণ্ঠস্বর যার মধ্যে একদিন শুনেছিলাম, স্বরটুকু বাদে তার ভাষা শুধু নয়, বাচনভঙ্গিও আলাদা। এমন অবিরাম কথার নির্ঝর প্রবাহিত করে রাখা তার পক্ষে অবিশ্বাস্য।

তা ছাড়া তার নামও সুমিতা ছিল না।

যতক্ষণ সঙ্গীতসুধার স্রোত বইছিল ততক্ষণ অন্য কোন দিকে কান দেবার সুযোগ পাই নি।

প্রাণমন তখন ত্রাহি ত্রাহি।

সে-কণ্ঠামৃতে কফিটাও বিস্বাদ লাগবার ভয়ে ধীরে ধীরে রয়ে সয়ে পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলাম।

গান ও তার অভিনন্দনে করতালি-ধ্বনি থামবার পর গায়িকা মেয়েটি আমারই সামনের দিকে একটি টেবিলে একজন বাদক সঙ্গীর সঙ্গে এসে বসল। গানে প্রাণ ঢেলে দেওয়ার পর সে-প্রাণের ঘাটতি পূবণ করতে কিঞ্চিৎ রসদের অবশ্যই প্রয়োজন। রেস্তোর্ঁার কর্তৃপক্ষই তা যোগান।

টেবিলের ওপর ভোজন পর্বের প্রাথমিক উপকরণ সাজানো যখন চলছে, গায়িকা মেয়েটি এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে হঠাৎ আমারই পেছনের দিকে কাকে যেন দেখতে পেয়ে উল্লাসে হাত তুলে হর্ষধ্বনি কবে উঠল।

ধ্বনিটা ঠিক বোধগম্য না হলেও আকারান্ত একটা নামের আভাস তার মধ্যে পেয়ে বুঝলাম সম্বোধনটা কোন পুরুষকে নয়।

পেছনের ভাষণ থেমে গিয়ে সেখান থেকেও 'হ্যালো লরা!' শুনে বুঝলাম কিছুটা উৎসুক য' করে তুলেছিল, এ সেই একই কণ্ঠস্বর।

শুধু সম্ভাষণ-বিনিময়েই ব্যাপারটা শেষ হলে, এ-কাহিনী লেখবার আর কোন কারণ থাকত না। কিন্তু প্রাথমিক ভূমিকার পর লরা তার টেবিলেই আমার পশ্চাৎবর্তিনীকে নিমন্ত্রণ করে বসল তার সঙ্গে অন্ততঃ একটু কফি খাবার জন্যে।

অদৃশ্যমানা একবার বুঝি মৃদু আপত্তি জানালেন।

কিন্তু লরার কাছে সে-আপত্তি টিঁকল না। তার টেসু

উচ্চারণে পশ্চাৎবর্তিনীর নামটাও বিকৃতভাবে এবার পাওয়া গেল। নামটা বাংলায় সম্ভবতঃ সুমিতা।

পিছন থেকে সুমিতা দেবীর লরার টেবিলে গিয়ে বসবার সময় আমি শুধু নয় সমস্ত রেস্তোরাঁই বোধহয় কৌতূহলী হয়ে তাঁকে লক্ষ করল। লরার সঙ্গীত নিত্য যাদের প্রাণে সুধা বর্ষণ করে সে-সব মুগ্ধ ভক্তেরা নিশ্চয় তখন ঈর্ষান্বিত।

আমি কিন্তু তখন রীতিমত বিস্মিত ও সংশয়াচ্ছন্ন।

প্রথমতঃ নবযৌবনা লরার বান্ধবী হিসাবে সমবয়সী কাউকেই দেখা যাবে আশা করেছিলাম। কিন্তু সুমিতা দেবী পশ্চাতের অপরিচয় থেকে লরার টেবিলে যাবার সময় সম্মুখের আলোয় দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বুঝলাম পোশাকে-প্রসাধনে আধুনিকা হলেও যৌবন-সীমা পার হ'তে তাঁর দেরি নেই।

বিস্মিত ও সংশয়াচ্ছন্ন শুধু ওইটুকুতে অবশ্য হই নি।

চালচলন পোশাক-আশাক ভাবভঙ্গি এমন কি শিক্ষা-দীক্ষায় ও নামেও আলাদা বলে চাক্ষুষ দেখার পরও এঁকে এত চেনা কেন মনে হয় বুঝতে না পেরেই অবাক ও চিন্তিত হলাম।

বাইরের কোন মিল না থাকা সত্ত্বেও আর একজনের কথা এঁকে দেখে এমন করে স্মরণে আসে কেন?

আমার দ্বিতীয় প্রস্থ কফিও ইতিমধ্যে ফুরিয়ে এসেছে।

আমাকে তাড়াতে না পেরে আমার টেবিলের অনিচ্ছুক বখরা-দারেরা নিজেরাই পাওনা চুকিয়ে এবার উঠে পড়লেন।

বাইরে বৃষ্টি থেমেছে বলে মনে হল।

আমার সুতরাং আর এখানে বসে থাকার কোন মানে হয় না। 'বয়'কে বিল আনতে বলে যতটুকু পারি সুমিতা দেবীকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে আমার অদ্ভুত ধারণার হেতু বোঝবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

সুমিতা দেবী তখন লরা ও তার বাদক সঙ্গীর সঙ্গে রহস্যালাপে মত্ত। মাঝে মাঝে হাস্যধ্বনির সঙ্গে যে দু-একটা কথার টুকরো কানে আসছিল তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে পরিধানে স্কার্টের বদলে শাড়ি থাকলেও সুমিতা দেবী ওই ইঙ্গফেরঙ্গ সমাজের আপনার লোক না হলেও অন্তরঙ্গ একজন।

এ-সুমিতা দেবীর সঙ্গে আমি যাঁর কথা ভাবছি তাঁর কোন সম্পর্ক থাকা অসম্ভব।

সে-বিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহ হলেও স্মৃতির অদ্ভুত অযৌক্তিক আলোড়নে নিজের ওপর একটু বিরক্ত হয়ে রেস্তোরাঁর পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বাইরে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু পথঘাট যানবাহনের অবস্থা শোচনীয়। ট্রাম বন্ধ, বাসে ওঠা সাধ্যাতীত। ট্যাক্সি তপস্যাতেও দুর্লভ। কাতারে কাতারে নিরুপায় জনতা ফুটপাথে অলৌকিক উপায়ে কোন যানবাহনে জায়গা পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছে।

তাদের সঙ্গেই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই জেনে, ফুটপাথ-ঢাকা বারান্দার একটি থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম।

খাড়া সেপাই-এর মত এই ভাবে কতক্ষণ কাটাতে হবে কে জানে।

আমার কিছুক্ষণ পরেই সুমিতা দেবীকেও রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াতে দেখে একটু বিস্মিত হলাম। সুমিতা দেবীর চেহারা-পোশাকে চালচলনে একটা অন্ততঃ ছোটখাটো মোটর নেপথ্যে থাকার আভাস যেন পেয়েছিলাম। সে-আভাস তাহলে অলীক!

সুমিতা দেবী খানিক দাঁড়িয়ে থেকে একবার বুঝি হেঁটে যাবার সঙ্কল্পেই কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই কয়েক পা-ই। যেখানেই তাঁর গন্তব্য হোক এই কোথাও-আধ-ডোবা কোথাও-

পেছল রাস্তা দিয়ে যাওয়া সাধ্য হলেও সমীচীন নয় বুঝেই বোধহয় তিনি আবার ফিরে এসে বারান্দার নিচে দাঁড়ালেন।

ক'টা রাস্তার ছেলে প্রতিদিন ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে বা দেবার নামে এখানে যাত্রীদের কাছে কিঞ্চিৎ বকশিশ রোজগার করে। চেহারা পোশাক দেখে আজও তারা ট্যাক্সি ডাকবার আশ্বাস কাউকে কাউকে দেবার চেষ্টা করছে বকশিশের আশায়।

কিন্তু ট্যাক্সি আজ কোথায়, যে ডাকবে!

সুমিতা দেবীকে ক'টা ছোকরা গিয়ে 'ট্যাক্সি ডাকব মেমসাব!' বলে বিরক্ত করায় তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমারই ভাগ্যে অমন অলৌকিক আবির্ভাব ঘটবে কে জানত!

যে-থামটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেটা একেবারে রাস্তার ধারে ফুটপাথের একটি কোণে। হঠাৎ পাশে চাকার শব্দ শুনে চমকে ফিরে দেখি—যা স্বপ্নেও অভাবিত সেই ফ্ল্যাগ-তোলা ললাটে-বহ্নিলিপি-জ্বালানো একটি ট্যাক্সি আমারই পাশের রাস্তা থেকে এসে মোড় ফিরছে।

মুখে 'ট্যাক্সি' বলে হাঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার হাতলটা ধরে ফেলেছিলাম, নইলে মরীচিকা-মায়ার মত সে-ট্যাক্সি মিলিয়ে যেতে বোধহয় দেরি হ'ত না।

কিন্তু দরজার হাতল ধরে দাবী সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও দখল প্রায় যাবার উপক্রম।

সুমিতা দেবীকে যে-কটি ছোকরা জ্বালাতন করছিল, তাদেরই একজন চক্ষের নিমেষে আমাব প্রায় পর মুহূর্তেই ছুটে এসে ট্যাক্সির সামনের দরজাটা তখন ধরে ফেলেছে।

দরজা খুলে ভেতরে উঠতে যাবার মুখেই সে-ছোকরার কথায় সমস্ত শরীর একেবারে জ্বলে গেল।

—এ ট্যাক্সি হামনে পহেলা লিয়া সাব!

ট্যাক্সির ঝগড়া কি কুৎসিত এমন কি সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে জানতে আমার বাকি নেই।

কে আগে ট্যাক্সি ডেকেছে তার মীমাংসায় ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সাক্ষ্যই চূড়ান্ত ও অকাট্য। এ-ছোকরা সুমিতা দেবীর হয়েই ট্যাক্সি ধরেছে বোঝা মাত্র ড্রাইভারের ধর্মজ্ঞান কতখানি টনটনে থাকবে বলা খুবই শক্ত। ছোকরার পক্ষেই মাথাটা একবার হেলালে আর উপায় নেই। ফুটপাতের এই জনতাই আমার বিরুদ্ধে রায় দেবে।

'তুমনে লিয়া!' বলে তাই রাগে প্রায় ফেটে পড়ছিলাম, এমন সময় সুমিতা দেবী নিজেই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তাঁকে দেখে সত্যি প্রমাদ গনলাম।

সে-ছোকরা'ত তখন সাপের পাঁচ-পা দেখেছে। গলার স্বরে যেটুকু সমীহ আগে ছিল এবার তাও বিসর্জন দিয়ে চড়া গলায় রুখে উঠল।

—জরুর লিয়া। মেমসাবকে লিয়ে। পুছিয়ে ড্রাইভারকো!

ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলে ফল কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু তার দরকার হ'ল না। সুমিতা দেবীই আশাতীত ভাবে সমস্যা মিটিয়ে দিয়ে বিমূঢ় করে দিলেন।

প্রথমে ছোকরাকে ধমক দিয়ে জানালেন যে তাকে গাড়ি ডাকতে তিনি বলেনও নি, আর গাড়িও সে আগে থাকতে ধরে নি। আমাকে আগে গাড়ি ধরতে তিনি নিজে দেখেছেন বলে আমাকেই তিনি এবার অনুরোধ জানালেন তাঁকে আমার ট্যাক্সিতে বেশী দূরে নয় এই ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট পর্যন্ত যদি আমি একটু পৌঁছে দিয়ে যাই।

এ-দুর্যোগে ট্যাক্সি পাওয়ার অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ড্রাইভারের অসহিষ্ণুতায় এবং সেই সঙ্গে নিজের কৃতজ্ঞতায় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে গাড়ির দরজাটা খুলে ধরে বললাম, কিছু আর বলতে হবে না, আসুন।

ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট বেশী দূরে নয়। একরকম ফিরিঙ্গি পাড়াই বলা চলে। সুমিতা দেবীর চেহারা-চরিত্রের মহিলার সেই অঞ্চলেই বাসা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু পৌঁছে দিতে গিয়ে বাসার বদলে একটা দোকান দেখে একটু বিস্মিতই হলাম।

এইটুকু পথ ট্যাক্সিতে আসতে আসতে সামান্য যা সৌজন্য বিনিময় হয়েছে তাতে ট্যাক্সি থামবার পর সুমিতা দেবী আমায় হঠাৎ একটু নামতে অনুরোধ করবেন এটাও কল্পনা করতে পারি নি।

একবার ট্যাক্সি ছাড়লে আর পাওয়ার অনিশ্চযতার কথা জানিয়ে যেটুকু আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম সুমিতা দেবী তা খণ্ডন করে বললেন —আপনার কোন ভাবনা নেই। ট্যাক্সি আপনাকে পাইয়ে দেবই। না পেলেও জলে পড়বেন না। বিপদে যে-সাহায্য করেছেন তাতে আমার দোকানটা আপনাকে একটু না দেখিয়ে ছাড়ছি না।

এই পোশাক-আশাকের দোকান আপনার!—শুধু সুমিতা দেবীর অনুরোধে নয়, নিজেরও অতৃপ্ত কৌতূহলে সত্যিই অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিতকে বিসর্জন দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে তাঁর দোকানে ঢুকতে ঢুকতে বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

সুমিতা দেবী আমার আপত্তি সত্ত্বেও নিজেই তখন ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছেন। আমায় ভেতরে নিয়ে গিয়ে পার্টিশনের পেছনের একটি কামরায় বসিয়ে একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ আমারই। নইলে রেস্তোরাঁয় লরার অত খাতিরের বহর কি দেখতে পেতেন! লরা-কে যা প'রে গান গাইতে দেখলেন তার দামটাও এখনো বাকি!

লরার খাতিরের রহস্য জেনে নয়, সম্পূর্ণ অন্য একটি ব্যাপারে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি যে ও-রেস্তোরাঁয় ছিলাম আপনি জানেন?

—তা জানি বই কি! বলে সুমিতা দেবী রহস্যময়ভাবে একটু

হেসে অনুরোধ করলেন, আপনি দু-মিনিট এই কাগজপত্রগুলো একটু দেখুন। দোকান বন্ধ করবার সময় হয়েছে। আমি সে-ব্যবস্থা করেই আসছি।

আপত্তির একটু ভান করে বললাম, কিন্তু আমায় বসিয়ে রেখে লাভ কি বলুন। মেয়েদের বিলিতি পোশাকের এ-দোকানে নিজে ত খরিদ্দার কস্মিনকালে হ'ব না, কাউকে জোটাতেও পারব না। আমি যাঁদের জানি তাঁদের দৌড় রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলেজ ষ্ট্রীটের বাইরে নয়।

আমার চোখের দিকে চোখ রেখে সুমিতা দেবী একটু বিদ্রূপের স্বরেই বললেন, খদ্দের বাগাবার জন্যে আপনাকে ধরে রাখি নি। আপনি কলেজ ষ্ট্রীট রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মানুষ, তাই জানেন না যে আমার দোকানের কিছু সুনাম তার নিজস্ব মহলে আছে। যা ফরমাশ আমরা পাই তাই মিটিয়ে উঠতে পারি না। সুতরাং আপনাকে ধরে রাখাটা নিছক কৃতজ্ঞতাই মনে করতে পারছেন না কেন?

সুমিতা দেবী পার্টিশনের অপর দিকে চলে যাবার পর বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়েই বসে থাকতে হ'ল।

সেদিন বাড়ি ফিরতে খুব বেশী রাত হয় নি। সুমিতা দেবী নিজেই পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর ট্যাক্সিতে। দোকান থেকে প্রতি রাত্রে তাঁর লাউডন ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবার জন্যে একটি ট্যাক্সির সঙ্গে তাঁর চুক্তি আছে। সেই চুক্তি-করা ট্যাক্সির ভরসাতেই তিনি আমাকে নিজের ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে বলার সাহস পেয়েছিলেন।

সুমিতা দেবীর দোকানের নাম-ঠিকানা-দেওয়া কার্ড আমার কাছে আছে। আর কোনদিন তাঁর সে-দোকানে বা লাউডন ষ্ট্রীটে তাঁর ফ্ল্যাটে হয়ত যেতে পারি।

কিন্তু গিয়ে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না।

সুমিতা দেবীর মধ্যে রহস্য যদি কিছু থাকে তা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হবার নয়।

একটি কুজ্মটিকার যবনিকা আমার স্মৃতিকে চিরকালই বুঝি ব্যঙ্গ করবে।

সেদিন এই যবনিকা সরাবার চেষ্টাই করেছিলাম। সুমিতা দেবী তাঁর দোকান বন্ধ করার কাজ সেরে ফিরে আসবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কতদিন আপনি এ-ব্যবসা করছেন?

আমার পাশের সোফায় বসে তিনি হেসে বলেছিলেন, প্রায় দশ বছর। কিন্তু এ-প্রশ্ন কেন? ইন্‌কাম ট্যাক্সে খবর দেবার জন্যে যদি হয় তাহলে জেনে রাখুন সেখানে আমার ফাঁকি নেই।

সুমিতা দেবীর লঘু পরিহাসটুকু অগ্রাহ্য করে গম্ভীর মুখে বলেছিলাম, কেন জিজ্ঞাসা করছি, শুনুন তাহলে। প্রায় পনেরো বছর আগে একটি মেয়ের সঙ্গে সামান্য পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু পরিবারের বজ্রকঠিন তেজস্বিনী একটি মেয়ে। কোর্ট থেকে একটা কমিশনে তাঁর জবানবন্দী নিতে কদিন তাঁর বাড়িতে যেতে হয়েছিল। তিনি যাকে পর্দানশীন বলে তা ঠিক নয়, তবে কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে নারাজ। তাঁদের বাড়ির মর্যাদায় তাতে আঘাত লাগে। মেয়েটি যেমন একটু অসাধারণ, কেসটাও ছিল তেমনি একটু বিচিত্র। তাই ভুলি নি। মেয়েটি মস্ত বড় এক ধনীর একমাত্র কন্যা। নাম ধরুন উমা। বাপ যথাযোগ্য পাত্রে উমার বিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন নিজের খরচেই। ছেলেটি কিন্তু সেখানে গিয়ে সত্যভ্রষ্ট হয়। একটি বিদেশী মেয়েকে সেখানে সে লুকিয়ে বিয়ে করে। কিছুদিন বাদেই ব্যাপারটা জানতে পারলেও বাপ বা মেয়ে ছেলেটির বিরুদ্ধে দেশে বা বিদেশে কোথাও কোন প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করেন নি, উমা শুধু বাপের শিক্ষায় ও

উপদেশে নিজেকে একান্তভাবে কঠোর ধর্মাচরণে আর শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত করেন।

ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে কিছুদিন বাদে উমার স্বামীর বিদেশিনী পত্নী মারা যায়। উমার বাবাও তখন গত হয়েছেন। স্বামী দেশে ফিরে এসে উমার কাছে ক্ষমা চেয়ে পূর্বের সম্পর্কে আবার ফিরে যাবার আবেদন জানায়। উমা কিন্তু বজ্রকঠিন। স্বামীর সমস্ত অনুনয়-বিনয়ে সে বধির। তার জীবনে অবিশ্বাসী স্বেচ্ছাচারী স্বামীর আর কোন স্থান নেই এই তার বক্তব্য।

চরম হতাশায় ঝোঁকের মাথায় ছেলেটি একদিন স্বামীত্বের অধিকার দাবী করে' আদালতে কেস করে' বসে। সেই মামলা বাবদই জবানবন্দী নিতে কদিন আমাদের মেয়েটির বাড়িতে যেতে হয়েছিল। শুদ্ধ পবিত্র নিষ্ঠাবতী এবং আগুনের শিখার মত তেজস্বী যে-মেয়েটিকে তখন দেখেছিলাম, আপনাকে দেখে কেন তার কথা মনে পড়ে গেল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

সুমিতা দেবী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ম্লান একটু হেসে বলেছিলেন, গল্পটা দেখছি নেহাত জোলো নয়। সেই মেয়েটির তারপর কি হয়েছে জানেন?

—না তা জানি না। খবর রাখবার চেষ্টা করি নি। তবে কেসটা মীমাংসা পর্যন্ত গড়ায় নি তা জানি। উমার স্বামীই নিজে থেকে একদিন মামলা তুলে নিয়ে আবার বিলেতে ফিরে চলে যায়।

সুমিতা দেবী কেমন একটু অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, এইখানেই গল্প আপনার শেষ? এ ত কমা-সেমিকোলন মাত্র, ভালো রকম দাঁড়িও পড়ল না।

—না তা পড়ল না।

—কিন্তু আমায় দেখে সেই আপনার শুদ্ধ পবিত্র নিষ্ঠাবতী আর সঙ্কল্পে বজ্রকঠিন উমার কথা মনে পড়ল, এ তো বড় আশ্চর্য। কোনো সম্পর্ক কি আমাদের মধ্যে থাকা সম্ভব?

—তা নয় বলেই ত অবাক হচ্ছি!

—উমাকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হলে কি করতে হয় জানেন? সুমিতা দেবীর গলার স্বর লঘু কৌতুকেই বুঝি কেমন অস্বাভাবিক শুনিয়েছিল।—উমাকে একদিন পূজা জপতপের ও কঠিন কৃচ্ছ্র সাধনের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে নিজের হৃদয়কে অকস্মাৎ আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হতে হয়। যাকে নির্মম হয়ে সে ফিরিয়ে দিয়েছে সাগর পারে, তার কাছেই আত্মসমর্পণ করবার জন্যে সমস্ত দেহ মন তার উন্মুখ এ-সত্য নিজের কাছে আর গোপন করা যায় না। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে স্বামীকে হয়ত দ্বিধা সঙ্কোচ জয় করে শেষ পর্যন্ত তাকে চিঠিই লিখতে হয়। কিন্তু সে-চিঠির উত্তর আসে না। উমা তবু হতাশ যেন না হয়। স্বামীকে সেই বিদেশে গিয়েই খুঁজে বার করবার জন্যে সে তখন প্রস্তুত। নিজেকে স্বামীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই তখন তার সাধনা। যে-ম্লেচ্ছাচারের জন্যে স্বামীকে সে ঘৃণা করেছে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাই তাকে দিয়ে বরণ করাতে হয়। এতদিনের শুদ্ধাচার ও সংস্কার ছেড়ে উমা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা আচার-আচরণে নিজেকে নতুন করে তৈরী করতে যেন মেতে ওঠে।

সংসারে সমাজে তার নামে কুৎসা কলঙ্কের তুফান তুলতে হয় এইবার। সব কিছু আয়োজন সম্পূর্ণ করে স্বামীর সন্ধানে সাগর পারে পাড়ি দেবার জন্যে যখন সে প্রস্তুত, তখন আনতে হয় লুব্ধ নীচ জ্ঞাতিকুটুম্বদের তরফ থেকে তার সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মামলা। গৃহবিগ্রহের নামে উৎসর্গ করা দেবোত্তর সম্পত্তিই ধরা যাক। স্বার্থের কুটিল ষড়যন্ত্রে আর আইনের জটিল প্যাঁচে ধর্মচ্যুত বলে সে-সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করা খুব কঠিন না হ'তে পারে। সমাজ সংসার থেকে বিতাড়িত প্রায় নিঃসম্বল উমার বিদেশে স্বামীর সন্ধানে যাওয়া আর হয় না। নিজের জীবিকা অর্জনই তখন তার কাছে সমস্যা হ'তে পারে। এই উমাকে

এবার একটু টেনে বুনে ইঙ্গ-ভারতীয় ফিরিঙ্গি সমাজে স্নুমিতা দেবী বলে যে পরিচিত তার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া বোধহয় যায়।

একটু থেমে বেশ উচ্চৈস্বরেই হেসে উঠে স্নুমিতা দেবী বলেছিলেন, কিন্তু এমন আজগুবি মিল কি কখনো সম্ভব? স্নুমিতা দেবীর মাঝখানে সেই আপনার তপস্বিনী উমাই নিরুদ্দেশ ম্লেচ্ছ স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় এখনো মিথ্যা আশায় দিন গুনছে, এ-কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে!

যথাসময়ে স্নুমিতা দেবার চুক্তি-করা ট্যাক্সি এসে বাইরে হর্ণ দিয়েছিল।

বেরিয়ে যাবার পথে দেয়ালে টাঙানো একটা ফটোর সামনে একটু দাঁড়িয়েছিলাম। স্নুমিতা দেবী তখন রাত্রে দোকান পাহারা দেবার জন্যে যে-পরিচারক সেখানে থাকে তাকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন।

নির্দেশ দেওয়া সেরে তিনিই এবার আমায় তাড়া দিয়েছিলেন যাবার জন্যে, আসুন আসুন, ট্যাক্সিওয়ালাদের মেজাজ ত জানেন।

ফটোটা ভালো করে দেখা হয় নি।

হয়ত দেখবার মত কিছু তা নয়।

একটা যন্ত্রণা, একটা অস্থিরতা, একটা কেমন অস্পষ্ট আতঙ্ক।

সব কিছু একসঙ্গে মিলিয়ে বিমূঢ় আচ্ছন্নতার মধ্যে কোথা থেকে তীব্র একটা উৎকণ্ঠার ঢেউ-এর পরে ঢেউ।

কয়েক মুহূর্ত এইভাবে যাবার পর তন্দ্রাটা চট করে ভেঙে গেল। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বলা-ই উচিত।

অন্ধকার ঘরটাই যেন তীব্র ঝনৎকারে আর্তনাদ করছে।

ব্যাপারটা ভয়াবহ কিছু নয় যদিও। ঘোরটা কেটে যেতেই বুঝলাম, ফোন বাজছে।

এত রাত্রে ফোন বাজা মানেই অবশ্য একটা দুঃসহ উপদ্রব। টেবিলের ওপর রাখা হাত-ঘড়িটায় দেখলাম রাত প্রায় সাড়ে বারোটা।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আচমকা-ঘুম-ভাঙার জড়তা নিয়ে ফোনটা তুলে একটু রুক্ষ স্বরেই বললাম,—হ্যালো······

আর যা বলতে চেয়েছিলাম বলা হ'ল না। আমার কথার মাঝখানেই ওধারের আওয়াজ শোনা গেল,—গলাটা ভার-ভার দেখছি। ঘুমোচ্ছিলে বুঝি?

এমন কথায় হাড়-পিত্তি জ্বলে যায় কি না! রাত্তির একটা বাজতে চলেছে। এমন সময় লোকে ঘুমোয় না'ত কি করে! মেজাজটা কোনরকমে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আপনি কে জানতে পারি? কাকে চাইছেন?

—কাকে চাইছি! ওধার থেকে একটু হাসির শব্দ শোনা গেল, চাইছি তোমাকে। শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর রায়কে। আর আমি হলাম ঈশ্বর ভবতোষ হাজরা, ওরফে ভবা। কেমন হ'ল?

—না, হল না। কড়া গলাতেই বলতে গেলাম, প্রথমতঃ আমি···

—নামটা পালটেছ। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ওধারে ভবা বা ভবতোষ যেই হ'ন পূরণ করে বললেন, তেমন অবস্থায় সকলকেই পালটাতে হয়। কিন্তু খোল-নলচে যাই বদলাও আমাকে ত ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি যে ঈশ্বর ভবতোষ। ঈশ্বর বলেই অবশ্য চিনতে পারছ না। শ্রীযুক্ত যখন ছিলাম তখন ভালোই চিনতে। দুবেলা এই অধীনের বাড়িতে ঘণ্টা কয়েক ক'রে না কাটালে ভাত হজম হত না। তারপর সেই মামলাটায় পড়ার পর থেকে অবশ্য ডুব মেরেছ। ডুবে ডুবে রত্নেশ্বর নামটাও ধুয়ে মুছে এসেছ। কিন্তু নাম পালটেও সেই আগের কারবারই চালাচ্ছ নিশ্চয় ?

ঘুমের দফা ত রফা হয়েছে। এই বাতুলকে শক্ত দুটো কথা শুনিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ মুখের রাশ টানলাম।

হেসে বললাম, না ভাই। একবার নাম পালটালে কারবারও পালটাতে হয। আমদানি রপ্তানি ছেড়ে এখন কারখানা খুলেছি। বন্ধুত্বের খাতিরে, এ-কারবার আর তোমায় ডোবাতে দেব না।

একটু থেমে আবার বললাম, কিন্তু তুমি কি করছ এখন ? চৌধুরীদের যে বাড়িটায় ছিলে সেটা ত দেনার দাযে নিলেম করিয়ে ছেড়েছ সেই কবে। নিজের বুদ্ধির দোষে কি সুবিধেটাই খোয়ালে বলো ত! পরের ধনে পোদ্দারি করছিলে, তার ওপর কলকাতা শহরে খাওয়া-পরা থাকার ভাবনাটাও ঘুচেছিল। কিন্তু সে-সুখ তোমার সইল না। তা এখন আবার কার স্কন্ধে ভর করেছ ? চৌধুরীর হাবাগোবা সেই ভাইপোটার ? সেই যে, ভালমানুষ পেয়ে বকিয়ে যার মাথায় হাত বোলাতে,—কি নাম যেন গণেশ, হ্যাঁ হ্যাঁ গণেশই ত!

ওপারে কয়েক সেকেণ্ড কোন সাড়াশব্দ নেই।

টেলিফোনটা নামাতে যাচ্ছি এমন সময় কানের পর্দা কাঁপানো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসই যেন শোনা গেল।

দীর্ঘনিঃশ্বাসের পর তারই সঙ্গে সুর মেলানো হতাশ কণ্ঠ,—গণেশ আর নেই।

—গণেশ নেই! সবিস্ময়ে আমাকেই জিজ্ঞাসা করতে হল, গেল কোথায়?

—মারা গেছে। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস।—যদিও মারাই গেছে বলা উচিত নয়।

সামলাতে আমার একটু সময় গেল। তারপর বললাম, শেষ পর্যন্ত মারাই গেল! তা যাওয়া আর আশ্চর্য কি! কাঁচা বাঁশে যখন ঘুণ ধরিয়েছিলে তখনই জানি সর্বনাশের বেশী দেরি নেই। কিন্তু তাহলে তোমার বেশ মুশকিল হয়েছে দেখছি। আস্তানা গাড়বার মত একটা জায়গা পাওয়া ত আজকাল সোজা নয়।

ওদিক থেকে এবার হাসির শব্দ এল। শুকনো বিরস হাসিই বলা উচিত। তার পর তাচ্ছিল্যভরে জবাব,—আমার আস্তানার জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই। ভুলে যাচ্ছ কেন আমি এখন ঈশ্বর ভবতোষ ওরফে ভবা।

—তা ঈশ্বর ভবতোষ, ভবলীলা সাঙ্গ করলে তাহলে!

—হ্যাঁ, তাই করতে হ'ল। ভবতোষের উদাস কণ্ঠ,—খবরের কাগজে দেখেছ নিশ্চয়।

—না, আমি আবার আইন-আদালতের পৃষ্ঠাটা পড়ি না।

—ও! পড়লেই ভয় হয় আবার বুঝি নিজের নামটা দেখতে পাও! সেই মামলার পর থেকেই অরুচি ধরে গেছে, কেমন? তবে আইন-আদালতের পৃষ্ঠায় নয়, আমার খবরটা······

থামিয়ে দিয়ে বললাম, তোমার খবরটা কাগজে না পড়েও জানি।

—জানো? ঈশ্বর ভবতোষ যেন একটু বিচলিত।

—হ্যাঁ, তোমায় একবার যখন চিনেছি তখন তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে কি আর কিছু বাকি আছে। তা ফন্দিটা ভালোই এঁটেছ।

—তুমি এটাকে ফন্দি বলছ! ভবতোষ ক্ষুণ্ণ কি না ঠিক বোঝা গেল না।—ফন্দিটা কোথায় পাচ্ছ?

—ওই ঈশ্বর হওয়াটাই একটা ফন্দি। এক ঢিলে এক-দুই নয়, একেবারে সব পাখি মারা হয়ে গেল। পাওনাদারদেরও ফাঁকি দিলে আবার আণ্ডা-বাচ্চাদেরও একটা গতি হয়ে গেল।

—আণ্ডা-বাচ্চা আবার কোথায় হে! ভবতোষ ক্ষুব্ধ।

—ও, তাহলে বানিয়ে বানিয়ে আমাকে ও-সব গল্প শোনাতে! সেই অজ কোন পাড়াগাঁয়ে যাঁকে ফেলে এসে কলকাতায় স্ফূর্তি করতে সেই তোমার স্ত্রী লীলা দেবী বলেও কেউ নেই বলবে বোধহয় এবার?

—তাইত বলতে হচ্ছে। ঈশ্বর হয়ে আর মিথ্যা কথাটা বলি কি করে!

—হুঁ, কিন্তু সারা জীবনের অভ্যেসটা কি অত সহজে ছাড়া যায়। সেই কি যেন নাম, ওই যে তোমার গণেশ চৌধুরীরই মাসতুতো বোন হে, পড়াবার নাম করে যার সঙ্গে প্রেম করতে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ রেবা, সেই রেবার কাছেও ওই মিথ্যেটা কেন চালাতে এখন অবশ্য বুঝছি।

—বুঝছ? ঈশ্বর ভবতোষ যেন খুশি।—রেবার কথা তাহলে তোমার মনে পড়ছে!

—পড়বে না? নিজের দাম বাড়াতে, কত ভালো ভালো লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ দেখাবার জন্যে আমাকে ধরে বেঁধে ও বাড়িতে কি কমবার নিয়ে গেছ! তা ছাড়া ওরকম একটি……

ইচ্ছে করেই ওইটুকু বলে থামলাম। ঈশ্বর ভবতোষ কেমন যেন অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ও রকম একটি কি?

—ও রকম একটি—সত্যের খাতিরে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি—হতকুচ্ছিত চেহারা আমি অন্ততঃ এখনো দেখি নি। ধরি মাছ না ছুঁই পানি কায়দায় নিজের কাজ হাসিল করতে তুমি হতাশ

প্রেমিক সাজতে তা কি আর বুঝি না! স্ত্রী থাকতে বিয়ের প্রস্তাবের ভয় নেই অথচ ভালবাসার ভান করে যা পাওয়া যায় হাতিয়ে নেওয়ার সুবিধে। তোফা আরামে দিব্যিই ত ছিলে। লোভটা একটু সামলে চললে ও-বাড়ি কি নিলেমে ওঠে! যাই হোক ঈশ্বর হয়ে একটা সুবিধে ত হয়েছে। ঝুটো বউকে ফেলে যাবার সুযোগ মিলেছে। ওই ট্রেনের 'মান্থলি'-টাতেই কাজ হল কেমন?

—ট্রে-ট্রেনের মান্থলি-তে কা-কাজ হল তুমি বলছ!—ঈশ্বর ভবতোষকে একটু তোতলা মনে হল।

—হ্যাঁ বলছি। আর আমায় বলতে হবে কেন, তুমি জানো না! হুণ্ডি কাটিয়ে কাটিয়ে গণেশকে ত তখন সেরে এনেছ। তার চুলের টিকিটি পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে। তা তাকে পালাবার পরামর্শ দিয়ে ভালোই করেছিলে। নিরুদ্দেশ হওয়া ছাড়া তার গতি কি! নিরুদ্দেশ হওয়ার পক্ষে বড় শহরের মত এমন সুবিধের জায়গা আর নেই, আর বড় শহরের মধ্যে বোম্বাইএর তুলনা হয় না। সেখানে কোট-প্যাণ্ট কি পাজামা-পাঞ্জাবি পরলে কে কোন মুলুকের, চেহারা দেখে চেনে কার সাধ্য।

দম নেবার জন্যে একটু থামতে ঈশ্বর ভবতোষ তাড়া দিলে, বলো, থামলে কেন?

তার তাড়া দেবার দরকার ছিল না। নিজের উৎসাহেই আমি বলে চললাম, সেখানেই নাম ভাঁড়িয়ে গণেশ তখন কোন অখদ্দে পাড়ায় ঘাপটি মেরে আছে। বুদ্ধি শুদ্ধি গণেশের চিরকালই ভোঁতা। নাম ভাঁড়াতেও তোমার নামটা ছাড়া আর কিছু মাথায় আসে নি। কিংবা তুমিই সে-পরামর্শ দিয়েছিলে, কেমন?

—তাতে আমার লাভ! ভবতোষ একটু থতমত খেল কি?

—বাঃ লাভ না থাক লোকসান ত নেই। আর শেষ পর্যন্ত এই ঈশ্বর হওয়াই মন্দ কি? গণেশ মাস কয়েক অজ্ঞাতবাস করবার পর

তুমি লুকিয়ে তার কাছে গিয়ে হাজির। দরদী বন্ধু সেজেই গেছলে। তবে তার আস্তানায় যাও নি। এখানে সেখানে, কখনো চৌপাঠিতে কখনো চার্চগেটে দেখা করেছিলে। তুমি যাবার কদিন বাদেই কিন্তু বোরিভিলির কাছে সেই দুর্ঘটনা। সকালবেলা দেখা গেছল লাইনের ধারে একজন যাত্রীর মৃতদেহ পড়ে আছে। অনেক রাত্রে বোরিভিলি থেকে বোম্বাই আসবার শেষ ট্রেনের কোনো কামরা থেকে সে-যাত্রী পড়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিংবা কেউ ঠেলেও ফেলে দিয়ে থাকতে পারে। বেশী রাত্রে বোম্বাই ফিরতি প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলো অনেক সময়ে একেবারে খালি থাকে। যাত্রীর পকেটে মাসিক টিকিটে তার নাম পাওয়া যায়। সে-নাম তোমার—ভবতোষ হাজরার। তুমিই ঠেলে দিয়েছিলে না কি কামরা থেকে? কিন্তু ভাবছি তাতে ঈশ্বর হওয়া ছাড়া তোমার অন্য লাভ কি।

—লাভ আছে, যথেষ্ট আছে। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ কামরা থেকে ঠেলেও দিতে পারি। ভবতোষ উত্তেজিত।

—দিতে পার মানে? এবার আমার হতভম্ব হবার পালা,—আবার ঠেলে দেবে কি?

—আহা, এইবারই ত দেব। আমি ওই খুন করবার প্ল্যানটাই যে ভাবছিলাম। অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, তোমার মানে আপনার ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা বলে দিন ত চট্ করে।

—আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর? কেন আমাকেও খুন করবার প্ল্যান আছে নাকি? আমি স্তম্ভিত।

—আরে না না, দরকার আছে। ছাপা হলে আপনাকেই পাঠাব।

—আমাকেই ছাপা হলে পাঠাবেন? কি পাঠাবেন?

—কি দেখতেই পাবেন। এখন বলুন চটপট করে ঠিকানাটা। না হয় শুধু ফোন নম্বরটা বলুন।

—কিন্তু ফোন নম্বর আবার দেব কি! নম্বর না জানলে ফোন করলেন কি করে?

—আপনিও যেমন! ওদিক থেকে অবজ্ঞার হাসি শোনা গেল। —নম্বর জেনে ফোন করেছি নাকি! আঙুলে যা পড়েছে তাই ঘুরিয়েছি। ফোনের লটারী বলতে পারেন। 'প্লট'-এর নতুন মারপ্যাঁচ বার করতে রোজ রাত্রেই প্রায় করি আমি।

—রোজ করেন! দুপুর রাত্রে ফোনের লটারী! আর তাতে আমারই মাথা বেগার খাটিয়ে নেওয়া! নাঃ, খুনের প্ল্যানটা আমারই দরকার মনে হচ্ছে। আপনার ফোন নম্বরটা···

ওদিকে খট্ করে ফোনটা নামিয়ে রাখার শব্দ শোনা গেল।

[বাংলার মফঃস্বলের একটি সাধারণ শহরে দোতলা একটি বাড়ির ওপরকার ঘর। ঘরটি শোবার ঘর নয়, বৈঠকখানাও বলা চলে না। খানিকটা নিজেদের মধ্যে পড়াশুনা গল্প-গুজব করবার, খানিকটা পোশাক-আশাক থেকে প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি রাখবার জন্যে ঘরটি ব্যবহৃত হয়। বই-এর একটি আলমারি আছে ঘরের বাঁ-পাশে, তার এধারে অর্থাৎ দর্শকের কাছের দিকে একটি ছোট টেবিলের উপর সেলাই-এর কল, পেছন দিকে দু'টি জানলার মাঝখানে একটি নীচু ড্রেসিং টেবিল। তার ওপর একটি দেয়াল ঘড়ি। ঘরের ডান দিকে নীচে নামবার সিঁড়ির দরজা তারপরে একটি দেরাজ। সামনে একটি নীচু টেবিলের চারিধারে সোফা কৌচ সাজান। ঘরের দুটি খোলা জানলা দিয়ে কয়েকটা খেজুর গাছের মাথা ও দূরের রাঙামাটির ঢেউ খেলানো দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। আকাশে গোধূলি বেলার রক্তিমা ক্রমশ ম্লান হয়ে অন্ধকার নেমে আসছে। ঘরে একটি কেরোসিন গ্যাসের বাতি ছাদ থেকে টাঙান। বাইরের আলো নিবে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটির উজ্জ্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যবনিকা ওঠবার পর দেখা গেল অনিতা দর্শকদের দিকে মুখ করে একটি কৌচে বসে বই পড়ছে। একটি জানলায় দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে সুরেশ দূরের দিকে চেয়ে আছে। অনিতাকে সুন্দরী কেউ বলবে না, কিন্তু বিচক্ষণ শিল্পী অনেকের মধ্যে তাকে একবার দেখে আর একবার তাকেই দেখবার জন্যে চোখ ফেরাবে। রোগাটে মুখে কোমলতার হয়ত একটু অভাবই আছে, কিন্তু চোখ দু'টির উদাস গভীরতা তাতে একটি অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা দিয়েছে। সুরেশকে দেহে ও মনে সুস্থ ও সবল চরিত্রের একটি প্রায় আদর্শ দৃষ্টান্ত বলে ধরা যায়। চলাফেরা ও কথাবার্তার

ধরনে যে-ক্ষিপ্রতাটুকু চোখে পড়ে সেটা প্রাণের প্রাচুর্যেরই লক্ষণ। অনিতা বই পড়তে পড়তে সেটা কোলের উপর নামিয়ে রেখে একবার পেছন ফিরে সুরেশকে দেখলে, তারপর বইটা আর না তুলে অন্যমনস্কভাবে সামনের দিয়ে চেয়ে রইল।

সুরেশ জানলা থেকে ফিরে এসে সোফার পিঠে হাতের ভর রেখে তার পিছনে দাঁড়িয়ে কৌতুকোজ্জ্বল মুখে তাকে যে লক্ষ্য করছে তাও অনিতার খেয়াল নেই।

হঠাৎ ঢং করে ঘড়ির ঘণ্টা বাজল।]

অনিতা—(চমকে উঠে ব্যস্তভাবে) কটা? কটা বাজল?

সুরেশ—সাড়ে সাতটা। তুমি আজ এত চঞ্চল কেন অনু?

অনিতা—চঞ্চল! না, না চঞ্চল কোথায়! কটা বাজল তাই জিজ্ঞেস করলাম শুধু।

সুরেশ—এই নিয়ে কবার ঘড়ির কথা জিজ্ঞেস করেছ মনে আছে! সত্যি করে বল তো কি হয়েছে তোমার আজ?

অনিতা—(চাঞ্চল্য দমন করবার ব্যর্থ চেষ্টায়) না, কই কিছুই ত হয় নি, কি আবার হবে!

সুরেশ—(ঘুরে এসে অনিতার পাশে বসে) কিন্তু যে-বইটা পড়তে বসেছ, গত পনেরো মিনিটে তার একটা পাতাও ওলটাও নি, তা জান? আমি সেইটেই লক্ষ্য করছিলাম। এত অন্যমনস্ক কেন?

অনিতা—অন্যমনস্ক? তা কখনো-কখনো একটু হতে নেই? (প্রসঙ্গটা বদলাবার উদ্দেশ্যে একটু হেসে উঠে) আচ্ছা, খুব ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে, না?

সুরেশ—বছরের এ-সময়টায় ঝড় ত এরকম রোজই প্রায় ওঠে। আজকের ঝড়টা বাইরের না মনের?

অনিতা—(হাসবার ভান করে) মনে আবার কিসের ঝড়? কি যে যা-তা বল?

সুরেশ—খুব যা-তা কি বলছি? আমি যে কাজে বেরিয়েও আবার ফিরে এলাম তাতে খুশি না হয় না হলে, এত অস্থির হয়ে আছ কেন?

অনিতা—এত বাজে কথা বললে স্থির থাকব কি করে? তুমি ফিরে আসায় খুশি হই নি আমি বলেছি?

সুরেশ—সব কথা কি মুখে বলতে হয়! আচ্ছা সত্যি কেন ফিরে এলাম বল ত লক্ষ্মীটি?

অনিতা—বাঃ তুমিই ত বললে, দইহাটি যাবার বাঁধের রাস্তাটা ভেঙ্গে গেছে, গাড়ি যেতে পারবে না, তাই—

সুরেশ—আমি বললাম আর তুমি তাই বিশ্বাস করলে? সামান্য একটা বাঁধের রাস্তা খারাপ হলে কি জরুরী তদন্তের সফর বন্ধ হয়?

অনিতা—(কাতরভাবে) আচ্ছা এসব কথা আমি জানব কি করে বল? তোমার কথায় বিশ্বাস করাটাও যদি আমার অপরাধ হয়—(গলাটা ধরে এল)

সুরেশ—অমন অভিমান করবার মত কিছু ত বলি নি লক্ষ্মীটি। আসল কথাটা এখনো বুঝতে পার নি দেখে আমারই বরং দুঃখ হতে পারে।

অনিতা—কি তোমার আসল কথা তা কি তুমি নিজেই বলতে পার না! জরুরী তদন্তের কাজ যদি হয়—

সুরেশ—তাহলে আমার যাওয়াই উচিত এই বলছ ত। বেশ, তাহলে যাই এখন?

অনিতা—এখন যাবে?

সুরেশ—গেলে আর দেরি করা উচিত নয়। তোমার একলা বাড়িতে থাকতে ভয় করবে না নিশ্চয়। ফিরতে আমার হয়ত বেশ রাত হয়ে যাবে।

অনিতা—না ভয় আর কিসের। এখানে আসার পর থেকে এরকম একলা থাকা ত এই প্রথম নয়।

সুরেশ—(এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে) আমার ভারী আশ্চর্য লাগছে অনু। মনে হচ্ছে আজ আমি গেলেই যেন তুমি খুশি হও।

অনিতা—(অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে কাতর ও তীক্ষ্ণ স্বরে) আমি! তুমি গেলে আমি খুশি হই! এসব তুমি কি বলছ? আজ তোমারই সত্যি কি হয়েছে!

সুরেশ—(এবার স্নিগ্ধস্বরে) সত্যিই আমার আজ যদি কিছু হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ আছে অনু? আজ কি তারিখ মনে আছে!

অনিতা— (হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে নিজের সংযম হারিয়ে) আজকের তারিখ! কেন? কেন? আজকের তারিখ নিয়ে তোমার কি ভাববার আছে!

সুরেশ—(সবিস্ময়ে) ওকি! অত উত্তেজিত হয়ে উঠছ কেন অনু? আমি ত শুধু আজকের তারিখটা মনে আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছি।

অনিতা—(দুর্বলভাবে একটু হেসে, নিজেকে সামলে নিয়ে) তুমি এমন অদ্ভুত ভাবে প্রশ্নটা করলে যে আমি একটু চমকে গিয়েছিলাম! আজ ত ৭ই চৈত্র।

সুরেশ—(একটু হেসে স্নিগ্ধস্বরে) আজকের তারিখ তোমার কাছে শুধু ৭ই চৈত্র, আর কিছু নয়?

অনিতা—তার মানে?

সুরেশ—এখনো মানেটা বুঝতে পারলে না? বুঝতে পারলে না কাজে বেরিয়েও কেন ছুতো করে বাড়ি ফিরে এলাম?

অনিতা—(বিস্মিত ও ঈষৎ ভীতস্বরে) সত্যি বুঝতে পারছি না! সত্যি বুঝতে পারছি না!

সুরেশ—(গাঢ় স্বরে) ওকি অনু! অমন অস্থির হয়ে উঠছ কেন? তোমার হয়ত মনে নেই, কিন্তু আমার মনে এই তারিখটা

একেবারে ছাপা হয়ে আছে। এই ৭ই চৈত্রই তোমার সঙ্গে আমার আর বছরে প্রথম দেখা! ঠিক এমনি সন্ধ্যেবেলা। (ঝড়ের হাওয়ার একটা দমকা চলে গেল) ঠিক এমনি তখন ঝড় উঠেছে। (ঝড়ের দাপটে দরজা জানলা সশব্দে নড়ে উঠল)

অনিতা—(উত্তেজিত ভাবে) কে,—কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে না!

সুরেশ—না ও শুধু ঝোড়ো হাওয়া! এখন মনে পড়েছে অনু? ঘাটে স্টীমার এসে লেগেছে, কিন্তু এমন ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ যে জেটিতে নামা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার। করেস্পন্ডিং ট্রেন ছেড়ে দেবে বলে লোকে তবু মরিয়া হয়ে নামবার জন্যে মোটঘাট নিয়ে ঠেলাঠেলি করছে। গ্যাংওয়ে ভেঙেই বুঝি পড়ে। কুলি পাওয়া দায়, যা-ও পাওয়া যায় তাদের হাঁক-ডাক শুনে পেছিয়ে যেতে হয়। এই দুর্যোগে একপাল দিশেহারা অসহায় মানুষের ভিড়ের মধ্যে তোমায় প্রথম দেখেছিলাম। নীচে নামবার সিঁড়িটার পাশে রেলিঙের ধারে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, ঝড়ের ঝাপটায় তোমার এলোমেলো চুল মুখে এসে পড়েছে। গায়ের শাড়ি গেছে বৃষ্টির ছাটে ভিজে। এমন একটা করুণ হতাশা তোমার মুখে যে চোখে পড়তেই আপনা থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

অনিতা—সত্যি সেদিন ওই সব মোটঘাট নিয়ে নামতে পারব বলে আশা ছিল না।

সুরেশ—নেহাত সাহস করে আমি নিজে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাই। নইলে নিজে থেকে তুমি বোধহয় কাউকে সাহায্য করতে ডাকতে না। আমাকেই তো বেশ একটু ভ্রূকুটি করে প্রথমটা হটিয়ে দিচ্ছিলে।

অনিতা—পারতপক্ষে কারুর সাহায্য নিতে আমি চাই না। সাহায্য নেওয়ার দায় মেয়েদের পক্ষে যে কি নিদারুণ হতে পারে তা তোমরা ত জান না!

সুরেশ—আচ্ছা, হয়েছে গো হয়েছে! অতি কড়া 'ফেমিনিষ্ট'-

এরও বিয়ে হলে রোগ সেরে যায় জানতাম, কিন্তু পুরুষের ওপর তোমার জাতক্রোধ আর গেল না। উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পুরুষ-ই বুঝি কোন মেয়ের জন্যে কিছু করে না?

অনিতা—তোমার সাহায্যটাও খুব নিঃস্বার্থ ছিল বলে এখন মনে হয় কি?

সুরেশ—(হেসে উঠে) তা ত ছিলই না। সত্যি অনু, সেদিন সেই ঝড়ের সন্ধ্যা আমার জন্যে কি সৌভাগ্য যে উদ্দাম হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল এখনো আমি অবাক হয়ে ভাবি, বিশ্বাস কর, তোমায় এতটুকু অচেনা মনে হয় নি, মনে হয়েছিল, যেন অনেক—অনেক আগে কোথায় যেন তোমায় হারিয়ে এসেছিলাম, হঠাৎ আবার খুঁজে পেয়েছি—

অনিতা—থাক ও-সব কথা—

সুরেশ—থাকবে কেন অনু? আজই ত আবার পুরনো পাতা উলটে সে-সব কথা রসিয়ে রসিয়ে রোমন্থন করার দিন। সেই ৭ই চৈত্র আবার ফিরে এসেছে। তেমনি আবার ঝড় উঠেছে দেখে তাইত আর কাজে যেতে মন উঠল না। ফিরে এলাম। (আবার ঝোড়ো হাওয়ায় জানলা-দরজাগুলো আছড়ে পড়ল)

অনিতা—(ভীত স্বরে) বাইরে সত্যি কে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে—

সুরেশ—(হেসে উঠে) ধাক্কা দিচ্ছে মেঘনার সেদিনকার সেই ঝড়। সেদিন যাদের অমন আশ্চর্য ভাবে মিলিয়ে দিয়েছিল আজ তাদের কুশল সম্ভাষণ করে যেতে চায়।

অনিতা—থাক্ আর কবিত্বে কাজ নেই। আচ্ছা, ঝড়টা খুব বাড়ছে, না? এ-রকম দুর্যোগে কেউ বোধহয় বাইরে বেরুতে সাহস করবে না।

সুরেশ—তোমার কোন ভয় নেই গো, ভয় নেই। আজ আমাদের কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। স্টীমার থেকে নামবার পর সেদিন কি মজাটা হয়েছিল মনে আছে?

অনিতা—ওই দুর্দশাকে তুমি মজা বল! কোথাও এতটুকু দাঁড়াবার জায়গা নেই, বৃষ্টিতে ভিজে জামাকাপড় সপসপ করছে।

সুরেশ—আমার কাছে সেইটেই ত মজা। কোন আশ্চর্য উপন্যাস থেকে ছিঁড়ে নেওয়া একটা অপরূপ পাত্র। অমন দুর্যোগ না হলে কি তোমার কাছে আর আমি পাত্তা পেতাম। স্টীমার থেকে নেমেই ত আমায় এড়িয়ে যাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলে।

অনিতা—বিপদে সাহায্য করেছেন বলে অচেনা একজন ভদ্রলোককে নাছোড়বান্দা হয়ে আঁকড়ে ধরে থাকব তুমি কি সেইটেই আশা করেছিলে!

সুরেশ—অতটা আশা না হয় নাই করলাম, কিন্তু সাহায্য করেছি বলে দুর্জনের মত আমায় পরিহার করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে,—এতে কি খুব খুশি হওয়ার কথা?

অনিতা—দুর্জন মনে করলে ত পরিহারই করতাম।

সুরেশ—তোমার দিক দিয়ে চেষ্টার ত কোন ত্রুটি ছিল না। আমি নেহাত নাছোড়বান্দা তাই। সত্যি অনু, সেই প্রথম দেখা হওয়ার পর গোড়ায় কিছুদিন কি দুঃখটাই আমায় দিয়েছ বল ত। যত ব্যাকুলভাবে আমি হাত বাড়িয়েছি তত যেন জেদ করে তুমি নাগালের বাইরে নিজেকে সরিয়ে রেখেছ। মেয়েদের এটা সহজে ধরা না দেবার ছল বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেব এমন একটু ক্ষণিক দুর্বলতার আভাসও তোমার কঠিন মুখে পাই নি।

অনিতা—(কাতরতার সঙ্গে) তোমায় ত বলেছি, কঠিন যা হয়েছি তা তোমার ওপর বিরূপ হওয়ার জন্যে নয়,—আমার জীবনের সঙ্গে কাউকে জড়াতে দেব না এই পণ ছিল বলে।

সুরেশ—কিন্তু অমন বেয়াড়া খেয়ালই বা কেন? মেয়েদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ান মানে কি জীবনের সমস্ত ছন্দ ভেঙে দিয়ে হৃদয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা? মনে আছে একই স্টেশনে দুজনে নেমেছিলাম, তোমার বাবার সঙ্গে তোমার ছোট দুটি বোন তোমায়

স্টেশন থেকে নিয়ে যেতে এসেছিল। কিন্তু পাছে তোমাদের বাড়ির সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাই বলে তাদের সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত করিয়ে দাও নি।

অনিতা—সে আমাদের মত গরিবের ছোঁয়াচ থেকে তোমায় বাঁচাবার জন্যেও ত হতে পারে। তুমি পাছে লজ্জা পাও তাই নিজে অভদ্র হয়ে তোমায় দায়মুক্ত করেছি।

সুরেশ—জেনে শুনে অমন অন্যায় আঘাত দিও না অনু, আমার ব্যবহারে কি সেই পরিচয়ই পেয়েছিলে? (ব্যাপারটা হালকা করবার জন্যে হেসে উঠে) তাছাড়া তোমরা তখন গরিব কিসের? তুমি ত দস্তুরমত ভালো চাকরিই কর তখন।

অনিতা—হ্যাঁ, এমন চাকরি করি যার জোরে একটা সংসার মৃত্যুর অতল গহ্বরের ওপর জীবনের শেষ প্রান্ত ধরে কোনো রকমে ঝুলে থাকতে পারে। কত দুঃখে সে-চাকরি নিয়েছিলাম যদি জানতে, কি বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের রাত তার আগে পার হয়ে এসেছি যদি তোমায় বোঝাতে পারতাম—

সুরেশ—এসব কথা বলছ কেন অনু? তোমার চাকরি করা নিয়ে বিদ্রূপ করব, এমন অমানুষ তুমি আমায় নিশ্চয় ভাব না। মেয়ে হয়ে অত বড় একটা সংসারের বোঝা তুমি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছ বলে তোমার ওপর শ্রদ্ধাই আমার বেড়েছে। শুধু আমায় কেন তুমি এতখানি ভুল বুঝেছিলে সেইটেই আমার কাছে এখনো আশ্চর্য লাগে!

অনিতা—কতবার তোমায় বলব, ভুল তোমায় বুঝি নি। আমি নিজে তোমার অযোগ্য বলে শুধু সরে যাবার চেষ্টা করেছি প্রাণপণে।

সুরেশ—আমি দুঃখ পাই বলেই কি এই কথাটা আমায় বারবার তুমি শোনাও অনু? না, আমারই যোগ্যতার অভাব তোমার মনের আয়নায় আত্মগ্লানি হয়ে দেখা দেয়!

অনিতা—না গো না, আমি যে জানি, আমি তোমার জীবনে না এলেই তুমি সত্যি করে সুখী হতে।

সুরেশ—(হেসে ব্যাপারটা হালকা করবার চেষ্টায়) পা পিছলে এসেই যখন পড়েছ তখন আর ত উপায় নেই। একবার হাতে পেয়ে আর ছেড়ে দেব এরকম আশা স্বপ্নেও করো না।

অনিতা—(কাছে এসে অত্যন্ত ব্যাকুল গাঢ় স্বরে) বল সত্যি ছাড়বে না ? যাই কেন ঘটুক, যাই কেন তুমি···

(ঝোড়ো হাওয়া প্রবলভাবে দরজা-জানলা নাড়া দিয়ে গেল)

সুরেশ—(সবিস্ময়ে) এ কি অনু ! চোখে তোমার জল কেন ? কি হ'ল তোমার হঠাৎ !

অনিতা—না, না ও কিছু নয়।

সুরেশ—মুখের না-টা চোখের জলে যে নাকচ হয়ে যাচ্ছে অনু ! মুখ না চোখ, কাকে বিশ্বাস করব ? শোন লক্ষ্মীটি, কাছে এস। (বিস্মিত ভাবে) একি গলাটা খালি কেন ! হারটা খুলে রেখেছ যে বড়। হাত দুটোও ত খালি দেখছি। এ আবার কি ধরনের যোগিনী বেশ—গয়নাপত্র সব খুলে ফেলেছ কোন দুঃখে ?

অনিতা—(কেমন দিশেহারা হয়ে) মানে—সারাক্ষণ কি সাজগোজ করে থাকতে হয় !

সুরেশ—(গম্ভীরভাবে) না অনু, কথাটা বড় বেসুরো বাজছে। সাজগোছ তুমি যদি কোনকালে বেশি করতে তাহলে তবু এরকম হঠাৎ বৈরাগ্যের মানে বোঝা যেত। সত্যি কি হয়েছে বল ত ?

অনিতা—কিছু হয় নি ত বলছি, এমনি খুলে রেখেছি, নাই বা পরলাম গয়নাপত্র, তাতে দোষটা কি ?

সুরেশ—দোষ একটু আছে বইকি অনু ! অলঙ্কার যেখানে শুধু ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন সেখানে তোমাদের নারীত্বকে তা অপমান করে, কিন্তু যে-অলঙ্কার তোমাদের শ্রী-কে ছন্দ দেয় তা বাদ দিলে

জীবনের মাধুর্যকেই অবজ্ঞা করা হয়। যাও লক্ষ্মীটি, অন্ততঃ গলার হারটা পরে এস।

অনিতা—আচ্ছা কিছুতেই যখন ছাড়বে না, তখন যাচ্ছি কিন্তু —(ঝোড়ো হাওয়ার শব্দের সঙ্গে বাইরের দরজায় জোরে কড়া নাড়ার শব্দ)

অনিতা—ও কি! ও কি!

(ঝড়ের শব্দ থেমে গিয়ে কড়ানাড়ার শব্দই এবার শোনা যাচ্ছে)

সুরেশ—কে যেন কড়া নাড়ছে।

অনিতা—(অস্থিরভাবে) না, না, হতে পারে না। এই ঝড় জলে কেউ আসতে পারে না। (কড়ানাড়ার শব্দ)

সুরেশ—(হেসে) কিন্তু এই ঝড় জলও মানে না—এমন গরজ কারুর আছে বলেই তো মনে হচ্ছে। রঘুয়া কোথায় গেল, দরজাটা খুলে দিতে পারে না!

অনিতা—রঘুয়া বাড়ি নেই—সন্ধ্যের আগে তাকে ছুটি দিয়েছি। (কড়ানাড়া ও দরজায় ধাক্কা)

সুরেশ—কি বুদ্ধি তোমার বল ত? আজ আমি বাড়ি থাকব না জানতে, তবু চাকরটাকে কি বলে ছুটি দিয়েছ! এই সন্ধ্যে থেকে একলা থাকতে হত ত। যাই আমি নিজেই দেখি গে। (দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা)

অনিতা—(ব্যাকুলভাবে) না, না, তুমি যেও না, ও হয়ত রাস্তার কোন বাজে লোক, এখুনি চলে যাবে।

(আবার কড়া নাড়া ও দরজায় ধাক্কা)

সুরেশ—পাগল! তা বলে একবার দেখতে হবে না! কেউ বিপদে পড়েও ত আসতে পারে। আমি যাচ্ছি।

(দরজা খোলা ও সুরেশের চলে যাওয়ার শব্দ)

অনিতার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ—ওঃ

কয়েক সেকেণ্ড ঘরে ঝোড়ো হাওয়া ছাড়া আর কিছুর শব্দ নেই, ঝোড়ো হাওয়ার একটা ঝাপটা চলে যেতে অনিতার প্রায় চুপি চুপি আকুল আক্ষেপ শোনা গেল,—কি করব আমি, কি করব এবার।

(তারপর বাইরে থেকে পায়ের শব্দ কাছে আসছে বোঝা গেল)

সুরেশ—কি লজ্জার কথা বল ত অনিতা, এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আর একটু হলে কে দরজা থেকে ফিরে যাচ্ছিল জান?

অনিতা—(কঠিন স্বরে) কেমন করে জানব, না বললে।

সুরেশ—(অনিতার স্বরের কাঠিন্যটা গ্রাহ্য না করে) ওঃ তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই নি বুঝি! আমার স্ত্রী অনিতা, আমার বন্ধু ভূধর। ভূধরের কথা তোমায় ত কতবার বলেছি।

ভূধর—হ্যাঁ এমনই বলেছ যে বাড়ির দরজাটা খুলতেও উনি সাহস করছিলেন না। কিছু মনে করবেন না অনিতা দেবী, একটা কথা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। অতিথি হিসেবে এই অভ্যর্থনাটা শুধু আমার একার জন্যেই বরাদ্দ, না, আপনাদের দাম্পত্যজীবনের রীতিই এই।

অনিতা—দাম্পত্যজীবনের শান্তি যারা ভঙ্গ করতে আসে এরকম অভ্যর্থনার জন্যে তাদের প্রস্তুত থাকাই উচিত।

সুরেশ—(হেসে উঠে) সাবাস অনু! ঠিক মুখের মত জবাব হয়েছে। জান অনু, ভূধরের মুখের জ্বালায় বরাবর আমরা অস্থির। জিবের বদলে ওর মুখে আলপিন আছে, যেখানে-সেখানে ফুটিয়ে দিয়েই ওর আনন্দ। আজ কিন্তু তোমার কাছে খুব জব্দ হয়েছে। (হাসতে লাগল)

ভূধর—স্ত্রী-সৌভাগ্যে তুমি বেশ গর্বিত মনে হচ্ছে সুরেশ। লড়াইটা আজকাল বুঝি স্ত্রীর অঞ্চলের আড়াল থেকেই করছ? এ-উন্নতি কতদিন হয়েছে?

সুরেশ—(স্ফুর্তির সঙ্গে) যতদিন থেকে ঐ অঞ্চলের হাওয়া

গায়ে লেগেছে। ও-হাওয়ার মর্ম ত আর বুঝলে না কোনদিন। হৃদয়ের জানলা-কবাট বন্ধ করেই রইলে চিরকাল।

ভূধর—ও-হাওয়ার মর্ম মর্মান্তিকভাবে বুঝেই হয়ত বন্ধ করেছি। তাছাড়া আপাততঃ হাওয়ার প্রসঙ্গটা খুব রুচিকর মনে হচ্ছে না। ছাতা ওয়াটারপ্রুফ সত্বেও স্টেশন থেকে এইটুকু আসতে ঝড়-জলের সঙ্গে পরিচয়টা বিশেষ মধুর হয় নি।

সুরেশ—সত্যি আজকের দিনে তুমি এমন করে এসে হাজির হবে ভাবতেই পারি নি।

ভূধর—একটু অভাবিত হয়েই এখানে আসতে চেয়েছিলাম। তবে মনে হচ্ছে তোমাদের পক্ষে বিস্ময়ের চমকটা একটু বেশী হয়ে পড়েছে।

সুরেশ—শুধু বিস্ময় কেন, আনন্দও বুঝি নেই তার সঙ্গে! সত্যি আমি যে এখানে আছি জানলে কি করে? এখানে আসার পর তোমায় চিঠিপত্র লিখতে ত পারি নি।

ভূধর—চিঠি কি বিয়ে করবার সময়েই লিখেছিলে? তা সত্বেও তোমার বিয়ের কথা যেমন করে জেনেছি ঠিক তেমনি করেই সংগ্রহ করেছি তোমার ঠিকানা, অর্থাৎ নিজের গরজে।

সুরেশ—(হেসে উঠে) বটে! গরজটা কিসের?

ভূধর—গরজ! গরজ হয়ত গায়ের জ্বালার। বন্ধু-বান্ধবের কেউ এমন পরমানন্দে কপোত-কপোতীর মত কূজন করে দিন কাটাবে এ কি সহ্য হয়। তাই কীট হয়ে বিষের হুল একটু ফোটান যায় কিনা দেখতে এলাম।

সুরেশ—(হেসে) বিষের হুল নিয়ে যারা বাহাদুরী করে, তেমন ফুলের সন্ধান পেলে তারাই মৌমাছি বলে প্রমাণ হয়ে যায়। তোমার ভাগ্যেও একদিন সেই সদগতিই না হয়ে যায়!

ভূধর—সে-রকম আশঙ্কা আছে' বলে মনে হয় না। মধু সম্বন্ধে কোনো দুর্বলতার পরিচয় ত এখনও পাই নি।

অনিতা—তা না পাবারই কথা। হুল থাকলেই মধুর মর্ম বোঝা যায় না। মৌমাছির হুল যেমন আছে তেমনি পাখাও আছে—আর কাঁকড়া বিছের শুধুই হুল।

সুরেশ—(হেসে উঠে) যোগ্যং যোগ্যেন। তোমায় স্বীকার করতেই হবে ভূধর, you have met your match. আমার স্ত্রীকে আগে চিনলে তুমি বোধহয় দন্তস্ফুট করতে সাহস করতে না। কেমন!

ভূধর—তোমার স্ত্রীকে না চিনলেও অনিতা দেবীকে আমি অনেক আগেই চিনতাম।

সুরেশ—আগে চিনতে! (একটু চুপ করে থেকে) ওঃ তাও ত বটে। ওদেব যেখানে বাড়ি সেই শহরেই ত তখন তোমার কাজ চলছিল। একথা আগে বলতে হয। অনুর কথার ধরনেই অবশ্য আমার বোঝা উচিত ছিল। তুমিও তাহলে আগে ভূধরকে চিনতে ?—না অনু ?

অনিতা—(কঠিন ও গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে) না ওঁকে কোন-দিন আমি চিনি না।

সুরেশ—সে কি! অথচ ভূধর ত তোমায় চেনে বলছে।

অনিতা—সেটা আমার অপরাধ নয়। উনি চিনলেই আমায় চিনতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমি ওঁকে চিনি না এইটুকু শুধু বলতে পারি।

ভূধর—এমন অবাক হবার ত এতে কিছুই নেই সুরেশ, আমাকে হয়ত উনি সত্যিই চেনেন না কিম্বা চিনলেও এখন ভুলে গেছেন এমনও তো হতে পারে।

অনিতা—না, তাও পারে না, আপনার মত লোককে একবার চিনলে আর ভোলা সম্ভব নয় বোধহয়।

ভূধর—সম্ভব নয়ই বা কেন অনিতা দেবী—বিশেষ করে সে-স্মৃতি যদি তেমন মধুর না হয়, যদি তার সঙ্গে শুধু বেদনা উৎকণ্ঠা

আর গ্লানি মিশে থাকে। (খানিক চুপ করে থেকে ভূধর যেন বাধ্য হয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে আবার বললে) মানুষের নিষ্ঠুর স্বার্থান্ধতা যখন দেশে বিধাতার অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়, বাড়িতে রুগ্ন বৃদ্ধ বাপ যখন অভাবের তাড়নায় আত্মসম্মান পর্যন্ত ভুলতে বসে, ফুলের মত কোমল অসহায় দুটি বোন যখন চোখের ওপর তিল তিল করে শুধু খাবারের অভাবে শুকিয়ে যায় তখন মানুষের চোখের জল হয়ত আর থাকে না, কিন্তু দৃষ্টি হৃদয়ের জ্বালাতেই ঝাপসা হয়ে আসে। মনে রাখবার মত করে কাউকে কি তখন চেনা যায়! আপনি আমায় না চেনার জন্যে তাই আমি এতটুকু দুঃখিত নই। আপনার কথায় অপমানের ইঙ্গিত না থাকলে এ-সব সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিলও করতাম না। আপনি না মনে রাখতে পারেন, কিন্তু প্রতিবেশী হিসেবে আপনাকে আমি সত্যি চিনতাম।

সুরেশ—সত্যি এ-প্রসঙ্গটা এখন বাদ দিলে হয় না?

অনিতা—এ-সব সাক্ষ্যপ্রমাণ শুধু কি আপনার নিজের সাফাই গাইবার জন্যে, না আমাদের তখনকার চরম দুরবস্থার কথা জানাতে? একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, আমার স্বামীর কাছে এসব খবর নতুন নয়।

ভূধর—দেখছি আপনি সত্যিই আমাকে ভুল বোঝবার জন্যে পণ করে বসে আছেন। নতুন খবর এখানে শোনাতে এসেছি এমন ধারণা আপনার হল কি করে? জিবটা আমার হুলের মত তীক্ষ্ণ বটে, কিন্তু বিশ্বাস করুন সত্যিই তাতে কোন বিষ নেই। দুনিয়ায় নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্যে শুধু একটু বিষের ভান করতে হয়।

সুরেশ—বিষ না থাকলেও দুজনেই জিব যেরকম শানিয়ে তুলেছ তাতে যে-কোন মুহূর্তে একটা রক্তারক্তি হতে পারে ভয় হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ভিজিয়ে একটু নরম করা দরকার। ঝড় ত প্রায়

থেমে গেছে, আমি রঘুয়াকে ডাকবার ব্যবস্থা করে আসি। একটু চা-এর বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি।

অনিতা—রঘুয়াকে কি দরকার? চা আমিই করে আনছি।

(অনিতা উঠে যাবার উপক্রম করতেই সুরেশ তাকে বাধা দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল)

সুরেশ—না, না, ঠাণ্ডা হয়ে বসে তুমি ততক্ষণ গল্প কর দেখি, আমি আসছি। দোহাই কথা কাটাকাটি আর নয়। ভূধরের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমি মনে করি। (সুরেশ চলে গেল। কিছুক্ষণ ঘর স্তব্ধ)।

অনিতা—(অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে তীব্র দৃষ্টিতে ভূধরের মুখের দিকে চেয়ে) যা বলবার আছে এইবার বলতে পারেন; আমি তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি।

ভূধর—(সবিস্ময়ে) তার মানে? সত্যি আপনার কথার মর্ম আমি বুঝতে পারছি না।

অনিতা—শুনুন, আর মিথ্যা ভান করবার কোন দরকার নেই। আপনাকে আমি সত্যিই চিনি না, কোন দিন দেখেছি বলে মনেও নেই, কিন্তু কেন আপনি এসেছেন তা আমি জানি। আপনার চিঠি আমি পেয়েছি।

ভূধর—চিঠি পেয়েছেন!

অনিতা—হ্যাঁ পেয়েছি, এবং তার ব্যবস্থাও করেছি যতদূর আমার সাধ্য। আমার স্বামী আজ হঠাৎ কাজ ফেলে বাড়ি ফিরে এসেছেন, নইলে অনেক আগেই আপনাকে বিদায় করতে পারতাম।

ভূধর—আপনি কি বলছেন অনিতা দেবী! আপনি ভয়ানক ভুল করছেন এইটুকু শুধু বলতে পারি। বিশ্বাস করুন সত্যি আমি সুরেশের বহুদিনের বন্ধু, তার হিতৈষী।

অনিতা—হ্যাঁ হিতৈষী বন্ধু ত নিশ্চয়ই, নইলে তার স্ত্রীর

জীবনের কলঙ্ক নিয়ে এমন লাভের ব্যবসা ফাঁদতে পারেন! (অনিতার স্বর তিক্ত বিদ্রূপ থেকে হতাশ বেদনায় নেমে এল এবার) এ-কলঙ্ক শুধু যদি আমাকেই জড়িয়ে থাকত, তাহলে মৃত্যু দিয়েই তা আমি মুছে দিয়ে যেতে দ্বিধা করতাম না জানবেন, কিন্তু যে-গভীর বিশ্বাসে আমার স্বামী আমায় বুকে টেনে নিয়েছেন, তা ভেঙে দিয়ে তাঁর সমস্ত জীবন ধ্বংস করে দিতে আমি পারব না। মিথ্যা দিয়ে প্রতারণা দিয়ে যেমন করে হোক এ-কলঙ্ক তাঁর কাছে আজ আমার গোপন করতেই হবে।

(অনিতা চুপ করল। তারপর চেয়ার থেকে উঠে দেরাজ খুলে একটা রুমালে বাঁধা পুঁটলি টেবিলের ওপর এনে ফেলে দিলে।)

অনিতা—নিন্ যা কিছু গয়না আমার ছিল সবই ওতে আছে। হিসেব আমি করি নি, বাজার দরও জানি না, কিন্তু চিঠিতে আপনি মুখ বন্ধ করে রাখার দাম হিসেবে যা চেয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী বই কম হবে না।

ভূধর—(গম্ভীরভাবে) শুনুন অনিতা দেবী।

অনিতা—(তীব্রস্বরে) বেশী চাপ দিয়ে আর কানাকড়িও আমার কাছে আদায় করতে পারবেন না। আমার যা-কিছু সাধ্য ছিল আমি দিয়েছি।

ভূধর—তা ত দিয়েছেন, কিন্তু আপনার স্বামীর কাছে এসব গয়না না থাকার কি জবাবদিহি দেবেন ভেবে রেখেছেন?

অনিতা—(ঝাঁঝাল গলায়) হ্যাঁ রেখেছি, বলব হারিয়ে গেছে। বলব, আমার বাপের বাড়িতে সাহায্য করবার জন্যে দিয়েছি। যা খুশি বলব তাতে আপনার কি আসে যায়। আপনি যান। এগুলো নিয়ে এখুনি বেরিয়ে যান!

(বাইরে থেকে পদশব্দ শোনা গেল, তারপর সুরেশের গলা)

সুরেশ—না, রঘুয়ার ত এখনো পাত্তা নেই। অনু, বাইরে কে একজন ভদ্রলোক এসেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

আমি চিনতে পারলাম না, পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে শুধু বললেন, তোমায় বললেই বুঝতে পারবে।

(ঘরে গভীর নিস্তব্ধতা)

সুরেশ—(একবার অনিতা ও একবার ভূধরের দিকে চেয়ে ঘরের অস্বস্তিকর আবহাওয়াটার কারণ বোঝবার চেষ্টা করে) কি ব্যাপার তোমাদের! চুপ করে আছ যে অমন করে? কি হয়েছে কি? (হঠাৎ টেবিলের ওপর রাখা পুঁটলিটার ওপর চোখ পড়ল) এ কি, টেবিলের ওপর এটা কি? (একটু পরে) এ কি, এসব গয়না এ-পুঁটলির মধ্যে কেন?

(সবাই নীরব)

সুরেশ—(তীক্ষ্ণ উত্তেজিত কণ্ঠে) তোমরা কি সব বোবা হয়ে গেছ! ব্যাপারটা কি হয়েছে তা জানবারও আমার অধিকার নেই?

ভূধর—(একটু নীরব থেকে) তোমার স্ত্রী আমায় তাঁর গয়নাগুলো দেখাচ্ছিলেন।

সুরেশ—তোমায় গয়না দেখাচ্ছিলেন? পুঁটলি করে বেঁধে! আমি কি শিশু না উন্মাদ? কি, তোমরা মনে কর কি! (টেবিল চাপড়ে) আমি জানতে চাই—কি রহস্য এর মধ্যে আছে।

ভূধর—(শান্ত বেদনাময় কণ্ঠে) এ-কৌতূহলকে প্রশ্রয় না-ই দিলে ভাই। জীবনে দু-একটা জিনিস অজানা থাকলে লাভ বই ক্ষতি নেই।

সুরেশ—(উগ্রস্বরে) রাখ তোমার দার্শনিকতা। আমার ধৈর্য নেই অত। বল কেউ কিছু বলবে কিনা!

অনিতা—(শান্ত কঠিন স্বরে শুরু করে ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠল) হ্যাঁ বলছি শোন। এ-সব গয়না আমি তোমার বন্ধু ভূধর-বাবুকে দিচ্ছিলাম তাঁর মুখ বন্ধ করবার জন্যে। কেন দিচ্ছিলাম বুঝতে না পেরে অবাক হচ্ছ নিশ্চয়। সেই কাহিনীই আজ

বলছি শোন। যার চেয়ে কলঙ্ক মেয়েদের নেই একদিন তাই আমার জীবনে ঘটেছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে। সমস্ত দেশে তখন শ্মশানের হাহাকার। চরম দুর্গতির পাঁকে একটু-একটু করে আমাদের সংসার তখন তলিয়ে যাচ্ছে। আমার বৃদ্ধ বাবার কোন উপার্জন নেই, রুগ্ন দুর্বল উপবাসী শরীরে উপার্জন করবার ক্ষমতা নেই। ছোট দুটি বোনকে সব দিন একটু ভাতের ফেনও যোগাড় করে দিতে পারি নি। খিদের জ্বালায় কাঁদতে কাঁদতে এমন ক্লান্ত হয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে যে মনে হয়েছে ঘুম বুঝি তাদের আর ভাঙবে না। আমার জীবনে তখন এক শনির আবির্ভাব হয়েছিল। যুদ্ধের কালো বাজারে ফেঁপে-ওঠা বড়লোক। প্রলোভন দেখাবার কোন ত্রুটি সে করে নি। বাবাকে ভালো চাকরি দিতে চেয়েছে, সমস্ত অভাব সমস্ত দুঃখ দূর করে দেবার আশ্বাস দিয়েছে। তবু ঘৃণা ভরে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু একদিন রাত্রে আমাদের বাড়িতে ডাকাতি হল। এক মুঠো খুদ যাদের ঘরে নেই তাদের বাড়ি ডাকাতির মানে বুঝিয়ে দেবার দরকার নেই। (একটু নীরব থেকে) তার পরের দিন ভারে ভারে আমাদের বাড়িতে জিনিস এল—টাকাপয়সা নয়, যা খেয়ে মানুষ বাঁচে, সেই অন্ন। কঙ্কালসার বোনদুটির কোটরে-বসে-যাওয়া চোখের দীপ্তি দেখে সে-অন্ন ফিরিয়ে দিতে পারি নি, ফিরিয়ে দিতে পারি নি। (হৃদয়ের গভীর থেকে উথলে ওঠা কান্না রোধ করবার চেষ্টায় অনিতা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করল) তার পরই যেমন করে হোক কাজ যোগাড় করবার চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লাম, চাকরিও পেলাম। তোমার সঙ্গে তারপর আমার দেখা। নিজের বুক ভেঙে গেলেও প্রাণপণে তোমার কাছ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারলাম না। এত সুখ এত ভালবাসার লোভ ছাড়তে পারলাম না শেষ পর্যন্ত। সেই অপরাধেরই শাস্তি আজ

আমি পেলাম। আমার কলঙ্কের কথা বাইরের কেউ জানে না। আমার জীবনের যে-শনি, আমার মত একদিনের বিলাসকে মনে রাখবার গরজ বা অবসর তার নেই। কিন্তু শনির পার্শ্বচর এমন কেউ ছিল যে এ-কলঙ্ক কাজে লাগাবার সুযোগ ছাড়ে নি। কিছু দিন আগে সেই এ-কথা চেপে রাখবার মূল্য স্বরূপ আমার কাছে টাকা চেয়ে পাঠায়। নির্বোধের মত আমি তাকে আজ এখানে আসতে বলেছিলাম। ভেবেছিলাম এমনি করেই আমার নিয়তির অভিশাপ আমি কাটিয়ে উঠব। নীচে সেই লোকই এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ভূধরবাবুকে ভুল করে আমি সেই লোক ভেবে অপমান করেছি। উনি যেন আমায় ক্ষমা করেন। (একটু নীরব থেকে) আর কিছু আমার বলবার নেই। নীচে যে এসেছে তাকে আমি বিদায় করে দিচ্ছি। এ-গয়না দিয়ে তার মুখ বন্ধ করবার আর দরকার নেই।

(গলাটা চাপা কান্নায় ধরে গেল। অনিতা দরজার দিকে এগিয়ে গেল)।

সুরেশ—(স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে) দাঁড়াও অনিতা।

অনিতা—(করুণ কণ্ঠে) বল কি বলবে? তোমার কিছু বলবার আর কিন্তু দরকার নেই। আমি নিজে থেকেই বিদায় নিচ্ছি। তোমার যে-ক্ষতি আমি করেছি তার ওপর আর কোন গ্লানি তোমার বাড়াব না। আমার কলঙ্ক যতটুকু তোমার জীবনে লেগেছে সব যদি মুছে নিয়ে যেতে পারতাম!

সুরেশ—এ-সব কথা আগে কেন বল নি অনিতা! কেন লুকিয়ে রেখেছিলে! অসহায় মেয়ে বলে এ-কলঙ্ক কি শুধু তোমারই? এ-কলঙ্ক কি সমস্ত পুরুষের নয়? পঙ্গুর মত উপবাসে যে-দেশ তিল তিল করে মরার অপমান সহ্য করে, তার নয়? এ-কলঙ্কের জন্যে শুধু তোমায় শাস্তি দিয়ে বিদায় দিলে কি গৌরব আমার বাড়বে? না অনিতা, কোথাও তুমি যেতে পার না।

এই কলঙ্কের কষ্টিপাথরে তোমার চরম মূল্য আমার কাছে যাচাই হয়ে গেছে।

অনিতা—(কাতর ভাবে) কি তুমি বলছ, বুঝতে পারছি না।

সুরেশ—বুঝবে! বুঝবে। সমস্ত জীবন ধরে বোঝাব। এখন নীচের ওই লোকটিকে বিদায় করে আসি। হাণ্টারটা বাইরের ঘরেই আছে।

অনিতা—ওগো—

সুরেশ—পিছু ডেকো না। (বেরিয়ে গেল দ্রুতপদে)

(কয়েক সেকেণ্ড নীরবতার পর)

ভূধর—মনে হচ্ছে নেহাত কাঁকড়া বিছে আমি নই। হুল যদি ফুটিয়ে দিয়ে থাকি, মধুও কিছু রেখে গেলাম।

সকালবেলা কামাখ্যা ডাক্তারের সংগে রুইদাসের একচোট হয়ে গেল।

—বলি কেমন ধারা ভেজাল বড়িগুলা দিচ্ছ বটে ডাক্তার, একমাস হয়ে গেল জ্বর আর গেল নি। কুইনাইন টুইনাইন কিছু নাই বুঝি—খালি নিমপাতা বাটা।

রুইদাসের কথাবার্তা বরাবরই একটু বেয়াড়া। অন্যদিন হলে কামাখ্যা ডাক্তার তাই কিছু গায়ে মাখত না। কিন্তু আজ চালকলের খোদ মালিকের ভাগনে ও ম্যানেজার বনোয়ারীলাল স্বয়ং এসেছে তার ডিসপেনসারীতে পেটের দরদের ওষুধ নিতে। এই সময় এ-রকম বেফাঁস কথায় কার না রাগ হয়। কামাখ্যা ডাক্তার দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, পছন্দ না হয় ত নিমপাতা নিজে বেটে নিলেই ত পারিস। আসিস কেন ব্যাটা!

—ব্যাটা ব্যাটা করোনি ডাক্তার। রুইদাস রাগলে কাকেও পরোয়া করে না। জানো!

—জানি জানি, ভারি আমার লেভেল ক্রসিং-এর জমাদার, তার আবার তেজ দেখ না। যা যা ব্যাটা এখানে তোর ওষুধ মিলবে না। কামাখ্যা ডাক্তার টেবিলের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে রুইদাসের হাত থেকে ওষুধের পুরিয়াটা সত্যিই ছিনিয়ে নিলে।

রুইদাস প্রথমটা কেমন ভ্যাবাচাকা হয়ে গেছল, পরের মুহূর্তেই একেবারে ফেটে পড়ল।—দেখলে সবাই তোমরা দেখলে! চামার ডাক্তারের ব্যাভারটা! হাতে থেকে ওষুধটা কেড়ে নিলে জোর করে! রুইদাসের রাগটা যেন এবার হতাশ কান্নায় মেশানো।

—তা কেড়ে নিবেনি? কাঠের গোলার ভরত এবার ডাক্তারের খোসামুদি করবার একটু সুযোগ পেয়ে ফোড়ন পাড়লে,

ডাক্তারের উপর ভক্তিছেদ্দা নেই ত ওষুধ নিতে আসা কেন! আবার বলা কিনা, নিমপাতা বাটা!

—তো নিমপাতা বাটা বলবে নি? কুইলাইন থাকলে একমাসের জ্বর একটু বাগ মানে না? কথাটা তেজের হলেও রুইদাসের সুর অনেকটা নরম। নেহাত হাতে-পায়ে ধরা ছাড়া আর যে করে হোক এখনও ওষুধটা ফিরে পেলে সে নেয়!

কিন্তু বনোয়ারীলাল হাওয়াটাকে আবার গরম করে তুললে, আরে কোথাকার লবাব তুমি হে, কুইলাইন লিতে আসছো, কুইলাইন লাট-বেলাট বলে পায় না। চার আনায় উনি কুইলাইন খরিদ করতে আসিয়েছেন!

বনোয়ারীলালের কথায় সবাই হেসে ওঠার সঙ্গে রুইদাসের রক্ত আবার মাথায় উঠে গেল।

—কেন চার আনা পয়সা কি পয়সা নয় যে ফাঁকি দিয়ে নেবে। কুইলাইন না থাকে ত এ-জুয়াচুরীর ডাক্তারি কেন?

কামাখ্যা ডাক্তার নিজের পেশাদারী গাম্ভীর্য এতক্ষণে আবার ফিরে পেয়েছে, তাছাড়া হেতুড়ে ডাক্তার হলে কি হয়, লোকটা নেহাত খারাপ নয়। সে এবার রেগে না উঠে ভারিক্কি সুরে বললে, যাও হে রুইদাস যাও, সকাল বেলায় ডাক্তারখানায় ঝামেলা করো না। ওষুধ পছন্দ না হয় নিও না, ব্যস ফুরিয়ে গেল। তোমায় ত আর জুলুম করে ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি না।

—গছিয়ে দিলেই আমি যেন নিচ্ছি! অত্যন্ত দুর্বলভাবে নিজের তেজটা বজায় রাখবার করুণ চেষ্টা করে রুইদাস ডাক্তার-খানা থেকে বেরিয়ে গেল। ইচ্ছে থাকলেও আর বেশিক্ষণ তার থাকার উপায় নেই। এক্ষুনি গিয়ে একটা মালগাড়ি পাস করাবার জন্যে গেট বন্ধ করতে হবে। সকালের দিকে মাত্র ঘণ্টাখানেক সে ছুটি পেয়েছিল। ভেবেছিল ওষুধ নিয়ে বাজারটাও একবার ঘুরে যাবে। কিন্তু তার আর সময় নেই। প্রায় ছুটতে ছুটতেই

গুমটি ঘরের দিকে সে নেহাত দম দেওয়া পুতুলের মতই এগোচ্ছে। কিন্তু মনটা তার কেমন যেন তছনছ হয়ে গেছে। কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল! কেনই বা যে এমন হয়ে যায়! আজ সে ডাক্তারের কাছে একেবারে কেঁদে পড়বে ঠিক করে এসেছিল। ভেবেছিল ডাক্তারের হাতদুটো ধরে বলবে, ছেলেটাকে ত রাখতে পারলে না ডাক্তার, ছেলের মাকেও কি পারবে না? একটা তেজী কিছু ওষুধ দাও ডাক্তার, যাতে একবার চোখ মেলে জেগে ওঠে। ও যে চোখ মেলে চাইতেও ভুলে গেছে! কিন্তু কি যে তার বদ্ স্বভাব, পেটের কথাগুলো গলা পর্যন্ত এসে কেমন ঝাঁঝালো তেতো হয়ে ওঠে। ফস্ করে কি যে বলে ফেলে কখন! সব কিছু ভেস্তে যায়।

অথচ কামাখ্যা ডাক্তার ছাড়া গতিও তার নেই সে জানে। ইষ্টিশানের কাছে বাজারের মাঝখানে পেতলের সাইন বোর্ড মারা ঘোষাল ডাক্তারের ডাক্তারখানায় তার মত লোকের পাত্তা নেই। আর কামাখ্যা ডাক্তার মানুষও সত্যি ভালো। কলকাতার কোনো ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারী ছেড়ে দিয়ে দেশে গাঁয়ে এসে নিজেই ডাক্তার বনে বসেছে বটে, কিন্তু অনেক পাস করা ডাক্তার তার কাছে হার মানে। গরিবের ঘরেই তার পসার। গরিবের সুখ-দুঃখ অভাব-অনটন সে বোঝে। ভিজিট পেলে নেয়, না পেলে খেতের লাউ-কুমড়ো-বেগুন দিয়ে এলেও ব্যাজার হয় না। ছেলেটার অসুখের সময় কামাখ্যা ডাক্তার কি না করেছে! ভিজিটের নাম গন্ধ নেই—দু-বেলা নিজের গরজে এসে দেখেছে, শেষ কটা দিন রাত পর্যন্ত জেগেছে যমের সঙ্গে যোঝবার জন্যে। কেন যে অমন কড়া কথাটা সে আজ বলে ফেললে! বলে ফেলে আর কথা কি করে ফেরাতে হয় সে জানে না।

—ওই রুইদাস এসে পড়েছে গো, দিবে এখুনি গেট বন্ধ করে—হেট্ হেট্!

রুইদাস লেভেল ক্রসিং-এর কাছে এসে পড়েছে। এক সার কাঠ বোঝাই গরুর গাড়ি চলেছে স্টেশনের দিকে। রুইদাসকে দেখে ক্রসিং পার হবার জন্যে তাদের তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। বড় কড়া ত্যাঁদোড় লোক রুইদাস তারা জানে।

রুইদাস কিন্তু গেটের দিকে যায় না। সোজা সে তার গুমটি ঘরে গিয়ে ঢোকে। রেল লাইনের পাশে লাল টালিতে ছাওয়া ছোট্ট একটি ঘর। একটা মানুষ হাত-পা গুটিয়ে কোনরকমে শুতে পারে। এরই ভিতর রুইদাসের গোটা সংসার কুলোতে হয়। সংসার বলতে অবশ্য এখন তার রুগ্না স্ত্রী রাখালী, সে ও একটা ছাগলী। ঘরের পেছন দিকে একটা টিন হেলান দিয়ে একটা ছাউনি মত করেছে। সেইখানেই রান্না হয়। ছাগলীটাও সেখানেই বাঁধা থাকে। ছেলেটার অসুখের সময় ধারধোর করে ছাগলীটা কিনেছিল তাকে দুধ খাওয়াবার জন্যে। ছাগলীটা বাচ্চা দেবার আগেই ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। ছাগলীটা তবু আছে। বাচ্চা হতে আর দেরি নেই।

সকালে যেমন দেখে গেছল রাখালী এখনও তেমনি জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে। শুধু ঘরটা জলে থইথই করছে। ঘরের মধ্যে কলসী থেকে একবার বোধহয় জল গড়িয়ে খেতে গেছল। বেকায়দায় কলসীটা উল্‌টে গেছে। রাখালীর শোবার কাঁথা মাথার চুল সমস্ত ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। কিন্তু তার সাড়া নেই।

জলটা ঝেঁটিয়ে এখুনি বার করে দিলে ভাল হয়। কিন্তু সময় নেই। রুইদাস রাখালীকে টেনে বিছানার অন্যদিকে একটু সরিয়ে দেয়। রাখালী অস্ফুট কি রকম একটা শব্দ করে মাত্র। একবার আচ্ছন্ন চোখের পাতাগুলো টেনে বুঝি খোলবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। কলসীটা গড়িয়ে গেলেও ভাঙে নি। যেটুকু জল তাতে ছিল তাই বাটিতে ঢেলে দিয়ে রুইদাস বাইরে বেরিয়ে আসে। মালগাড়ি পাস করবার আর দেরি নেই।

লাঠা দেওয়া গেটটা নামাতে নামাতে রুইদাস পেছনে দূরের রাস্তায় মোটরের হর্ণ শুনতে পায়। চাবি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটরটা সশব্দে পেছনে থেমে যেন রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করতে থাকে।

—এই, এই রুইদাস!

রুইদাস চাবিটা নীল কোর্তার পকেটে রেখে ধীরে সুস্থে পেছন ফিরে তাকায়। মোটর নয়, মোটর লরী আসছে ফুলডুংরি থেকে খোয়া পাথর বোঝাই করে। ড্রাইভার সাধন সিকদার নিজেই নেমে আসে গাড়ি থেকে। প্রথমটা কড়া মেজাজে বলে, গেট নামালে যে বড়। হর্ণ দিচ্ছি শুনতে পাও না?

—শুনব নি কেন, কালা ত নই।

—খুলে দাও গেট, এখনও গাড়ির অনেক দেরি।

ভ্রূক্ষেপ না করে রুইদাস ঘরের দিকে এগোয়।

রুইদাসকে চিনতে সাধন সিকদারেরও বাকী নেই। এবার তার সুর নরম হয়ে আসে। —বলি চলেই যাচ্ছ যে! শোন না।

রুইদাস জবাব দেয় না।

সিকদার এগিয়ে গিয়ে হাতটা ধরে ফেলে তার। অনুনয় করে বলে, একটি দিন শুধু ছেড়ে দে রুইদাস। সকাল আটটার মধ্যে একটা খেপ পৌঁছে দেবার কথা। ন'টা প্রায় বাজে। কণ্ট্রাক্টরের নতুন সরকার বেটা এসে অবধি আমার পেছনে লেগেছে। আজ বাগে পেয়ে চাকরিটা খতম করে ছাড়বে।

রুইদাসের মনটা বুঝি একটু নরম হয়। কিন্তু খিঁচিয়ে উঠে সে বলে, অত যদি গরজ ত আরও ভোর ভোর উঠতে পার নি? নেশা ভাঙ করে পড়েছিলে বুঝি?

এবার রেগে উঠে রুইদাসের হাতটা ছেড়ে দিয়ে সিকদার বলে, নেশা-ভাঙ করে পড়ে থাকি আমি! বড় বেশী তোর তেজ হয়েছে রুইদাস। যা মুখে আসে তাই বলিস। ভারী এক রেল

গেটের জমাদার হয়ে ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করিস। কিন্তু তোর এ-তেজ ভাঙবে, আর দেরি নেই। তোর মত কুকুরের মুগুরও আছে জানিস।

রুইদাস উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। সিকদারের অভিশাপগুলো শুনেও সত্যি তার রাগ হয় না। নিজের দোষ সে জানে। জানে যে কেউ তাকে দেখতে পারে না, বন্ধু বলতে কেউ তার নেই। শুধু তার এই মুখের দোষে নয়, বেয়াড়া ঘাড়ের জন্যেও বটে। ঘাড় হেঁট করতে পারে না বলেই জীবনভোর মাথাটা তার ঠুকতে ঠুকতেই গেল। নোয়ানো মাথার মাপে দুনিয়ার সব দরজা যখন কাটা তখন মাথা সোজা করে কোনখানে তার জায়গা মিলবে? সব দরজাতে তার তাই শুধু মাথাই ঠুকেছে, পার হওয়া আর হয় নি।

চাষার ঘরের ছেলে, কিন্তু চাষবাস তার ধাতে সয় নি। ধান কাটতে যাকে নুইতে হয় তার মাথা যে আর কোথাও তোলবার নয় সেটা তার বোধগম্য হয় নি। জমিদারের পাইকের সঙ্গে মারপিট করে প্যাঁচাল এক দাঙ্গার মামলায় পড়ে তাই তাকে দেশত্যাগী হতে হয়েছে। ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব নেই, খাটবার গতরও আছে জোয়ান শরীরে, তাই কাজের অভাব হয় নি। রেল লাইনে ভালো, কাজই সে পেয়েছে, কিন্তু বুঝে শুঝে চলতে পারে নি কোথাও। ওপরওয়ালাদের নেক নজরে পড়ে নি কোন মতেই, সমান-সমানদের সঙ্গেও বনিবনা হয় নি।

পয়েন্টস্‌ম্যান থেকে নেমে তাই লেভেল ক্রসিং-এ এসে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু নেহাত কাজের গুণে। কাজে ফাঁকি নেই, নিয়মকানুন এক চুল নড়চড় হতে সে দেয় না। তাছাড়া ওপর নীচে কারুর সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধবার অবকাশই এই নির্বাসনের রাজ্যে নেই।

তবু নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে সে শিখল কই? মেজাজ তার কিছুতেই

শোধরাবার নয়, মুখও রাশ মানে না। জ্বরে এমন করে বেহুঁশ হয়ে যাবার আগে রাখালী এক-একদিন বলেছে, আমি মরলে তোমায় একাই কাঁধে করে পোড়াতে নিয়ে যেতে হবে। কেউ তোমার বাড়ির ছায়া মাড়াবে নি।

রুইদাস দাঁত খিঁচিয়ে বলেছে বটে, তোকে পোড়াতে আমি একাই পারব। সে-ক্ষ্যামতা আমার আছে। কিন্তু মনে মনে সত্যি তার নিজের ওপর ধিক্কার এসেছে। কেন সে আর সবাইকার মত নয়! কেন সে পায়ে পা মিলিয়ে পারে না।

আজও বাইরের টিনের ছাউনিটার তলায় ইঞ্জিনের পোড়া কয়লা দিযে উনুনটা ধরাতে ধরাতে নতুন করে সে সঙ্কল্প করে ভাল মানুষ হবার। না, ঘাড় আর সে তুলবে না। ঘাড় সোজা করে এতদিন শুধু ধাক্কাই যদি খেয়ে থাকে, এবার ঘাড় নীচু করেই দেখবে লাভ কিছু হয় কি না! রাখালীকে 'কুইলাইন' নইলে বাঁচান যাবে না সে জানে। কুইনিন তার মত হেঁজিপেঁজির জন্যে নয়। হোমরা-চোমরাদের হাতে পায়ে ধরলে হয়ত একটু পাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে অনুগ্রহ করে। তাই সে ধরবে। কোথাও না হয় খোদ হাকিমের কাছে গিয়ে ধরনা দিয়ে পড়বে। জংশন স্টেশনে ট্রেন ধরবার সুবিধের জন্যে হাকিমের গাড়ি প্রায়ই ত এই রাস্তা পার হয়ে যায়। সেই সময়েই একেবারে পা জড়িয়ে ধরবে।

কি একটা গোলমাল যেন তার ঘরের দিকেই এগুচ্ছে শুনে রুইদাস পিছু ফিরে তাকায়। মালগাড়ি তখনও পাস করে যায় নি। এত গোল তা হলে কিসের!

দরজার কাছে কটা ছায়া পড়ে।

—কোথায় হে রুইদাস! কড়া গলায় জবরদস্ত হাঁকের পর আরো দুচারজনের সঙ্গে খোদ হাকিম সাহেবের উর্দিপরা চাপরাশি এসে দরজায় দাঁড়ায়।

রুইদাস ব্যাপারটা প্রথম ঠিক বুঝতে পারে না, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

চাপরাশি গম্ভীর গলায় জানায়,—হাকিম সাহেব তলব করেছেন, চলো।

—হাকিম সাহেব তলব করেছেন। রুইদাস নিজের কান দুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। মনে কথাটা উঠতে না উঠতে এত সহজে এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে সে যে ভাবতেই পারে নি।

—কোথায় হাকিম সাব! ব্যস্ত হয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। চাপরাশি মুখ বেঁকিয়ে বলে, হাকিম সাহেব কি তোমার দোরগোড়ায় হেঁটে এসেছেন, তিনি মোটরে আছেন, চল।

চাপরাশির মুখ বাঁকানিটাও রুইদাস গায়ে মাখে না। একবার রাখালীর দিকে তাকায়। মুখটা তার ঘেমে উঠেছে। এইবার জ্বর ছাড়বার পালা। একটু ওষুধ যদি সময় মত পড়ে তাহলেই বোধ হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। কলম নিশ্চয় হাকিম সাহেবের কাছেই আছে। এক টুক্‌রো কাগজ সে যোগাড় করে নেয়।

চাপরাশি ধমক দিয়ে ওঠে।—বলি কি হচ্ছে কি! হাকিম সাহেব কি তোমার জন্যে বসে থাকবেন নাকি।

—না এই যে যাই। রুইদাসই সবার আগে বেরিয়ে পড়ে। চারিধারে যে-গুঞ্জন ওঠে তার আসল মানেটা তার মাথায় তখনও ঢোকে নি।

রেল গেটের এপাশে গোটা দুই লরী, খানকয়েক গরুর গাড়ি এর মধ্যে জমা হয়ে গেছে, তার ভেতর হাকিম সাহেবের মোটরকে সসম্ভ্রমে সামনের দিকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

রুইদাস সেই মোটরের দিকেই এগোয়। পেছন থেকে চাপরাশি ধমক দিয়ে বলে, ওদিক্ পানে যাচ্ছ কোথায় হে, আগে গেটের চাবি খুলে দাও।

রুইদাস সে-কথায় কান দেয় না। সটান হাকিম সাহেবের মোটরের কাছে গিয়ে হাজির হয়। তারপর সত্যি সত্যি মাথাটা নুইয়ে সেলাম করে বলে, হুজুর···একটু যদি দয়া করেন।

হাকিম সাহেব একটু অবাক হন। একটু অপ্রসন্নও। রাস্তায় ঘাটে বেকায়দায় পেয়ে তাঁকে দিয়ে এ-রকম দয়া করিয়ে নেওয়াটা মোটেই তাঁর পছন্দ নয়। তা ছাড়া চাপরাশি বেয়ারার বেড়া কি জন্যে আছে, যদি তাঁর ওপর যে সে এসে এমনভাবে চড়াও হতে পারে! তবু চড়াও যখন হয়েছেই তখন বিরক্ত হলেও পোশাকী একটু হাসি টেনে তিনি বলেন, এখন তুমি গেটটা একটু খোল দেখি। কথাটা নিজেই তাঁকে বলতে হয় বলে বেশী খারাপ লাগে।

রুইদাস তবু নড়ে না। কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দয়া করে একটা সই করে দেন হুজুর। কুইলাইন অভাবে বউটা মরতে বসেছে। আপনি একটু কলম ছোঁয়ালেই আর ভাবনা থাকে নি।

হাকিম সাহেব সত্যি বদমেজাজের লোক নয়। বরং এই এক বছরে এই মহকুমায় উদার অমায়িক বলে বেশ একটু সুনামই তিনি অর্জন করেছেন। কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি তা বলে কি করে বরদাস্ত করা যায়। মুখে তাঁর একটু ভ্রূকুটি দেখা দেয়।

চাপরাশি এই ভ্রূকুটিটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। রুইদাসের কাঁধটায় একটা ধাক্কা দিয়ে বলে, কি ঝামেলা লাগিয়েছ এখানে, যাও গেট খুলে দাও।

রুইদাসের ঘাড়টা একটু যেন টান হয়ে ওঠে। চাপরাশির ধাক্কাটা গ্রাহ্য না করে সে আবার বলে, দোহাই হুজুর, গরিবের ওপর একটু দয়া করুন।

চাপরাশি বুঝি এবার ঘাড় ধাক্কাই দিতে যাচ্ছিল। হাকিম সাহেব হাত নেড়ে তাকে নিষেধ করে আবার পোশাকী হাসি

টেনে বলেন, আমি কি দয়া করব, বল? কুইনিন দরকার হয় ডাক্তারকে দিয়ে সই করিয়ে নাও গে যাও।

—ভিজিটের অত টাকা কোথায় পাব হুজুর। ভিজিট না দলে ডাক্তার ত সই করবে নি।

—তাহলে আমি কি বলতে পারি বল? কুইনিন ত আমার দয়ার ব্যাপার নয়, আইনের ব্যাপার! হাকিম সাহেব এবার বিরক্তিটুকু গোপন করেন না।

—আইনের ত আপনারাই মালিক হুজুর!

হাকিম সাহেবের এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তবু নিজেকে সামলে গম্ভীর ভাবে বলেন, মালিককেও আইন মানতে হয় বুঝেছ, যাও এখন গেটটা খুলে

—গেট ত খুলতে পারব না হুজুর। রুইদাস এবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

হাকিম সাহেব প্রথমে কথাটা শুনেছেন বলে বিশ্বাসই করতে পারেন না। আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মত খানিক স্তম্ভিত হয়ে থেকে তিনি অবশেষে বলেন, পারবে না মানে? নিজেকে সামলাতে চোখ তাঁর তখন লাল হয়ে উঠেছে।

—খোলবার আইন নাই হুজুর

—আইন থাকে না থাকে আমি বুঝব। আমি বলছি তুমি গেট খুলে দাও। যথাসাধ্য সরকারী গাম্ভীর্য বজায় রাখবার চেষ্টা সত্বেও মনে হয় গলাটায় একটু যেন চিড় ধরেছে।

—মাপ করবেন হুজুর, পারব না। আইন মালিককেও মানতি হয়।

শুধু হাকিম সাহেবের মুখের ওই চেহারাটুকু দেখবার দরকার ছিল।—এত বড় আস্পর্দ্ধা! ছোট মুখে এত বড় কথা! চাপরাশির চড়টা সজোড়ে গালে এসে লাগে, আরদালির রদ্দাটাও সেই সংগে ঘাড়ে। ছুজনে নেকড়ে বাঘের মত রুইদাসের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রুইদাসের হাতের একটা ঘা খেয়ে চাপরাশি মাটি নেয় বটে কিন্তু সে নিজেও তখন ছিটকে পড়েছে। কানের ঘুসিটায় মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলেও হুঁশ তার যায় নি। যতগুলো মানুষ তার চারধারে ভিড় করে এসেছে সবাই তার বিপক্ষে সে জানে। কেউ তাকে পছন্দ করে না, তার হয়ে দাঁড়াবার কেউ নেই। এতগুলো লোকের কাছে তার জারিজুরি বেশিক্ষণ খাটবে না সে বোঝে। কিন্তু তবু হার সে মানবে না কিছুতেই। এখনও গেটের চাবি তার কাছে। সে চাবি দেবে না প্রাণ থাকতে। যেমন করে হোক এ-চাবি তাকে এদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। চাপরাশি মাটি থেকে উঠে আবার তার দিকে তেড়ে আসছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভিড়ের একটা ফাঁক দিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে যায়। জমাট মানুষের ভিড় কি করে তার সামনে ধোঁয়ার মত ফাঁক হয়ে যায় সে বুঝতে পারে না।

পেছনে একটা মস্ত শোরগোল উঠেছে সে টের পায়। কিন্তু একবার ভিড় থেকে বেরিয়ে পিছু ফিরে আর সে তাকায় না। লাইনের ওধারে রেলের তারের বেড়া টপকে গেলে কটা কাঁটা ঝোপে ঢাকা পাথুরে ঢিবি। সেই ঢিবিগুলোর ওধারেই দুর্ভেদ্য ঘন জঙ্গল দূরের পাহাড় পর্যন্ত ছড়ান। সোজা সেই জঙ্গলের দিকে রুইদাস রওনা হয়। একেবারে ঘন গাছের ঝোপে গিয়ে না পৌঁছান পর্যন্ত সে আর থামে না। চারিদিকে তাকিয়ে এবার সে বুঝতে পারে এতদূর পর্যন্ত তার পিছু নিতে কেউ পারে নি।

সারাদিন বনের মধ্যে লুকিয়ে কাটিয়ে গভীর রাত্রে রুইদাস চুপিচুপি চোরের মত তার ঘরের দিকে ফেরে। সারাদিনের অনাহারে দুর্ভাবনায় শরীরটার চেয়ে মনটাই তার যেন ভেঙ্গে পড়েছে, নিজের আহাম্মুকির জন্যে আপশোষের তার আর সীমা নেই তখন। রাখালীর এতক্ষণে কি হাল হয়েছে কে জানে? বেঁচে যদি বা থাকে প্রাণটা ঠোঁটে এসে ঠেকেছে সন্দেহ নেই। কেউ

একবার উঁকি মেরে দেখে তার মুখে একটু জল দেবে এতটুকু আশাও সে করতে পারে না। সবই তার দোষ। না, এইবার সে সত্যি করে নিজেকে শোধরাবে পণ করেছে। রাখালীকে একবার দেখে সে হাকিম সাহেবের কাছে গিয়ে ধরা দেবে। মাটিতে মাথা লুটিয়ে মাপ চাইবে। যা শাস্তি নেবার নেবে। ঘাড় আর সে জীবনে সোজা করবে না।

সন্তর্পণে উঠোনের দিকের বেড়াটা টপকে পছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। তারই আলোয় জন তন চার লোককে সেখানে দেখা যাচ্ছে। রুইদাসের পায়ের শব্দে ফিরে তাকিয়ে 'কে?' বলে একজন উঠোনে বেরিয়ে আসে। রুইদাস অবাক হয়েই বোধহয় আর পালাবার চেষ্টা করতে ভুলে যায় লোকটা আর কেউ নয়, সাধন সিকদার।

সিকদার তাকে প্রায় জঁড়িয়ে ধরে বলে, তা বলে এই এত রাত করে! আমরা ত ভাবছিলাম, বুঝি আজ আর আসবিই না।

অন্যেরাও এখন তাদের কথা শুনে উঠোনে নেমে এসেছে। রুইদাস বিমূঢ় ভাবে তাদের দিকে তাকায়। সাধন সিকদার, নরহরি মালি, এমন কি কামাখ্যা ডাক্তার পর্যন্ত এত রাত অবধি তার ঘরে বসে আছে তারই অপেক্ষায়।

ধরা গলায় সে জিজ্ঞাসা করে কোনরকমে, কেমন আছে এখন!

—তোর বউ! ভাল আছে, ভাল আছে! সিকদার জবাব দেয়, কামাখ্যা ডাক্তার নিজে হাতে ওষুধ এনেছে, চারটিখানি কথা ত নয়!

—মিথ্যে মিথ্যে সকাল বেলা আমায় যা নয় তাই বলে মেজাজটা বিগড়ে দিয়ে এলি! কামাখ্যা ডাক্তর হাসতে হাসতে বলে, থাকলে আর ভালো ওষুধ দিই না!

নরহরি তাড়া দিয়ে বলে, সময় বড় অল্প হে, ভোর না হতেই

হয়ত থানার লোক এসে হানা দেবে। যা সলা-পরামর্শ করবার এইবেলা সেরে ফেল।

তারা সবাই ঘরে দিয়ে ওঠে। রাখালী ঘুমিয়ে আছে। তার পাশে আর একটি কে মেয়ে ঘোমটা টেনে বসে আছে। অবাক হয়ে রুইদাসকে সেদিকে চাইতে দেখে সিকদার যেন একটু লজ্জা পেয়ে বলে, নিয়ে এলাম বৌটাকে! দেখাশুনা করতে একটা মেয়েছেলে ত চাই।

এবার তাদের পরামর্শ শুরু হয়। রুইদাস হতভম্বের মত শুনে যায় শুধু শহরে বাজারে নাকি হইচই পড়ে গেছে। তার নামে নাকি হুলিয়া বেরুবে। জবর খুন জখম দাঙ্গার দায়ে তাকে জড়ান হয়েছে। আরদালির দুটো দাঁত ভেঙেছে, চাপরাশির গা থেকে হয়েছে রক্তপাত। রেলের চাকরির দফাও তার রফা। ওপর-ওয়ালাদের কাছে খবর গেছে।

তা যাক, কুছপরোয়া নেই। সিকদারও বেশিদিন এখানে আর থাকছে না। রুইদাস চায় ত মামলা লড়ুক, আর নয় ত সিকদার এখুনি বেরিয়ে পড়তে রাজি তাকে নিয়ে। কেউ তাদের চুলের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাবে না। রুইদাসের বউ-এর জন্যই বা ভাবনা কিসের? সিকদারের যা হোক একটা চুলো ত আছে। সেখানে তার বউ-ছেলেমেয়ের জন্য যদি দু-মুঠো জোটে তাহলে রুইদাসের বউকেও উপোসী থাকতে হবে না। আর তারা দুটো জোয়ান মদ্দ—এত বড় দুনিয়ায় তাদের দানাপানি কি কোথাও মিলবে না?

রুইদাস অবাক হয়ে এদের মুখের দিকে চায়। শুধু লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় এদের মুখ এত জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে নি। কি একটা নতুন কিছু যেন তারা পেয়েছে। রুইদাসকে তারা বিষনজরে দেখে না। তার বেয়াড়া ঘাড় তার ঝাঁঝালো তেতো মুখ তারা যেন নতুন একদিক থেকে দেখেছে। হয়ত কাল সকাল পর্যন্ত এ-

উৎসাহ তাদের সবার থাকবে না, তবু হঠাৎ তারা যেন এইটুকু আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গেছে যে, মাথাটা উঁচু করে রাখবার জন্যেই ঘাড়ের ওপর বসান, মাটিতে লুটোবার জন্যে নয়।

———